শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | মার্চ ২০০৯ | বিনিময়: ২ টাকা

তীব্রতর হচ্ছে
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন

সৌমিত্র গুহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ক্রমেই এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দীর্ঘদিনের স্থিতাবস্থা কাটিয়ে প্রতিবাদী কর্মচারী শুধুমাত্র প্রতীকি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচীর মধ্যেই তার ক্ষোভকে সীমিত রাখতে আর রাজি নন। তাই কর্মচারী আন্দোলন ক্রমেই উন্নত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দাবী আদায়ের কার্যকরী আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গর শাসকদল সি.পি.এমের সমর্থক কর্মচারী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চোখরাঙানি ও হুমকি অগ্রাহ্য করে প্রতিবাদী কর্মচারীরা আরো বেশি করে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছেন।

পাঁচ, ছয় বা সাতের দশকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে সংগ্রামী ভূমিকা ছিল ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসতেই সেই ভূমিকা আমূল বদলে গেল। বামফ্রন্ট সরকারকে স্থায়িত্ব দেওয়াই তার প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সংগঠন বেশ কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করে। প্রথমত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনগুলিকে ধীরে ধীরে দখল করে কো-অর্ডিনেশনের অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়াও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নূতন ক্ষেত্রগুলিতে দ্রুত সংগঠন গড়ে তোলা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশনের অন্তর্ভুক্ত করা। বিভিন্ন ক্যাডারের পরিসর থেকে উঠে আসা স্বতঃস্ফূর্ত ও যৌক্তিক দাবিগুলিকে সাধারণভাবে কো-অর্ডিনেশনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি সীমাবদ্ধ রাখা প্রভৃতি। কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলেবর যতই স্ফীত হয়েছে ততই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তিমিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সর্বত্র বিরাজমান বিপুল এক পরিকাঠামো নিয়ে কো-অর্ডিনেশন আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

বিশালত্ব সম্পর্কে সাধারণ এক সমীহ মানুষের মধ্যে কাজ করে। কো-অর্ডিনেশনের বিশাল অস্তিত্বের সাথে বামফ্রন্টের প্রশ্নহীন স্থায়িত্ব মিলেমিশে কর্মচারী সমাজের মননে এক ভীতির সৃষ্টি করেছিল। যেকোন বিরোধী স্বরকে নির্মমভাবে দমন করার কাহিনী কর্মচারীসমাজে ছড়িয়ে আছে। চাকরি জীবনে ক্ষতি করা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের নানা কাহিনী প্রায় মিথের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'বিরোধী' তকমাধারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুগামী সংগঠন বা গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের মত সমস্ত স্তরের কর্মচারীরর একত্রিত 'Unitary' সংগঠন সাধারণভাবে প্রচার, বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি করলেও কো-অর্ডিনেশনের একাধিপত্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। উপরন্তু এই সংগঠনগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কর্মচারী আন্দোলনে কোন সার্বিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমানের চিত্রটি কিন্তু দিন বদলের সংকেত নিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আবহ কর্মচারী আন্দোলনে একটি সক্রিয় সচেতন নবীন প্রজন্মের উঠে আসা একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে স্থায়িত্ব দিতে হবে, কারণ এ সরকার শ্রমিক কৃষকের বন্ধু সরকার, তাতে যদি কিছু আর্থিক বঞ্চনা মেনে নিতে হয় ভালো — এ সমস্ত কথা কর্মচারীকুল তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আর মেনে নিতে রাজি নন। ফলতঃ কর্মচারী আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে।

মহাকরণে গত ১৯শে আগস্ট, ২৬শে আগস্ট ও ১১ই সেপ্টেম্বর যে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ ঘটে এবং যা মুখ্যসচিবের আদেশনামা অগ্রাহ্য করেই দিনের পর দিন সংগঠিত হতে থাকে এবং যার ফলশ্রুতিতে গত ২২শে জানুয়ারি একটি সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট হয়, তা কিন্তু দিনবদলের ইঙ্গিত নিয়ে আসছে।

কিন্তু প্রতিবাদী সংগঠনসমূহের মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যে বিভ্রান্তি, বিতর্ক এবং সংশয় আছে তার সমাধান হয়নি। চালু সংগঠনগুলি বহুক্ষেত্রেই জায়মান কর্মচারী বিক্ষোভকে ধারণ করতে অপারগ হচ্ছে। অতএব আন্দোলন যত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, সঠিক সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যেও প্রস্তুতি চলছে।

(লেখক রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের ট্রেড ইউনিয়নের

এ.এন.আই ইনফোজেন
মাইনে বকেয়া, পলাতক মালিক
রাস্তায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এতদিন যা দেখা যেত জুট মিল বা চা বাগানের ক্ষেত্রে, মালিকী শোষণের সেই নগ্ন রূপ এবার প্রকাশ্যে চলে এল বুদ্ধবাবুদের ধ্যান-জ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পেও। যখন 'পুঁজিবাদের পথিক' বুদ্ধবাবুরা বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দায় কিঞ্চিৎ দিশেহারা, যখন সেই ধাক্কায় টাটা-জিন্দালরা সব 'কর্মসংস্থানে'র ঝোলানো মুলোস্বরূপ শিল্পগুলোকে আপাতত শিকেয় তুলেছে, তখন এ যেন মড়ার ওপর খাড়ার ঘা। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্সের একটি কোম্পানী এ.এন.আই ইনফোজেন-এর মালিক তার ১২০০ কর্মীর তিন মাসের বেতন বাকী রেখে, নতুন ঢোকা ট্রেনিদের থেকে ৫০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিয়েছে।

আমরা 'এ.এন.আই.ইনফোজেন' নামে একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মী। আমাদের অফিস সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সে; ব্লক ই.পি এবং জি.পি, কলকাতা ৭০০ ০৯১।

২০০৪ সাল থেকে কলকাতায় এই সংস্থা তাদের কাজকর্ম শুরু করে। বর্তমানে কর্মীসংখ্যা হাজারেরও বেশি। তার মধ্যে বেশিরভাগই নতুন। অনেকেই মাত্র গত বছর কাজে যোগ দিয়েছে। কেউ কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেলেও এখনও কাজে যোগ দেয়নি। গত জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে হঠাৎ করে কোনওরকম নোটিশ ছাড়াই আমাদের কর্তৃপক্ষ সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। এখনও পর্যন্ত তাঁকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সংস্থার প্রায় একহাজার কর্মীর প্রত্যেকটা দিন কাটছে চরম অনিশ্চয়তায়।

আমাদের প্রায় সবাইকেই বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে 'ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ'-এর মাধ্যমে এই সংস্থায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ 'অফ্ ক্যাম্পাস' ইন্টারভিউ পেয়েছে কোনও প্লেসমেন্ট সংস্থার মাধ্যমে। বেশিরভাগ কর্মীই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল 'সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপার' হিসাবে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার সময় নতুনদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কোম্পানী ৫০,০০০ টাকা করে জমা নেয়। শুরু থেকেই আমরা এখানে নানান অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছিলাম। সংস্থার পক্ষ থেকে 'ট্রেনিং' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও কোনও অফিশিয়াল ট্রেনার আমাদের ছিল না; সিনিয়রদের কাছ থেকেই আমাদের কাজ শিখতে হত। এর সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের অসহযোগিতা ছিল। ছিল কাজের পরিবেশের অভাব। এর মধ্যেই গত তিনমাস আমাদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এমনও অনেকে আছে, যারা তিনমাস ট্রেনিং করেছে, কিন্তু একটা পয়সাও পায়নি। আমরা প্রতিবাদ শুরু করলে ২১ জানুয়ারি আমাদের সবাইকে একটি করে 'পোস্ট ডেটেড চেক্' দেওয়া হয়। কিন্তু ভাঙানের সময় সব চেক্ গুলিই বাউন্স করে; উল্টে আমাদেরই অ্যাকাউন্ট থেকে 'সার্ভিস চার্জ'-এর টাকা কেটে নেয় ব্যাঙ্ক। এর আগে কোম্পানি একবার 'বেতন দেওয়ার পয়সা নেই' এই অজুহাতে কর্মীদেরই বেশ কয়েকজনকে গ্যারান্টার করে ব্যাঙ্ক লোন নেয় এবং কর্মীদের দিয়ে ওভার ড্রাফ্‌ট-এ সই করিয়ে নেয়। কোম্পানীর অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্ক এখন সেই কর্মীদের ওপরেই চাপ দিচ্ছে লোন-এর টাকা শোধ করার জন্য। এসব নিয়ে কর্মীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ যখন বাড়ছে, তখনই হঠাৎ সংস্থার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে গা-ঢাকা দেয় কর্তৃপক্ষ। থানায় এফ.আই.আর. করেও এখনও পর্যন্ত কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায় আমরা সমস্ত সহকর্মীদের নিয়ে দল-মত নির্বিশেষে এ.এন.আই. ইনফোজেন এমপ্লয়িজ সেভ্ কমিটি গড়ে তুলেছি। আমাদের দাবী—

- **অবিলম্বে ইনফোজেন খুলে সমস্ত কর্মীকে তাঁদের কাজ ও তিন মাসের বকেয়া টাকা দিতে হবে।**
- **অবৈধভাবে কোম্পানী বন্ধ হওয়ায় সমস্ত কর্মীকে সরকারী ভাতা দিতে হবে।**
- **কেউ স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লে তাঁকে জমা রাখা ৫০,০০০ টাকা ফেরত দিতে হবে।**
- **অবৈধভাবে কোম্পানী বন্ধ করা ও মাসের পর মাস বেতন না দেওয়ার জন্য মালিককে শাস্তি দিতে হবে।**
- **পলাতক মালিকের সম্পত্তি ক্রোক করে কর্মীদের প্রাপ্য টাকা দিতে হবে।**

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা— সরকারের এই ঢাকঢোল পেটানো বক্তব্যের জেরে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়তে গিয়েছিলাম। তারপর এই কোম্পানীতে ঢোকার সময় আবার আমাদের টাকা জমা দিতে হল, বন্ডে সই করতে হল যে দুবছর আমরা অন্য কোথাও যেতে পারবো না (বন্ডে এও বলা ছিল যে কোম্পানীও আমাদের কাজ থেকে ছাড়াতে পারবে না)। কোম্পানীটি সরকার অধীনস্থ বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ করলো, ২০০৪ থেকে সেক্টর ফাইভে ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্সের মত জায়গায় ব্যবসা চালালো, সরকারী মেলা ইনফোকমে অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে থাকলো—এটা পরিষ্কার যে সরকারের মদত ছাড়া এসব হতে পারে না। সরকার কিছু জানে না বলে হাত গুটিয়ে থাকতে পারে না। আমরা মনে করি, এটা সরকারের শিল্প সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে, তাই এই সমস্যার উদ্ভব ও পরিণতির জন্য সরকারই দায়িত্ববদ্ধ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের অনুরোধ—আসুন, সরকারকে তার যথাযথ দায়িত্বপালনের দাবীতে আমরা জোরালো জনমত গড়ে তুলি।

হ্যাঁ, এটাই কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত লিফলেট। কোনদিন যারা এভাবে রাস্তায় নামতে হবে ভাবেনি, সেই প্রাইভেট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা সফটওয়্যার প্রফেসনালরা আজ মিটিং-মিছিল-অবস্থান-কনভেনশনের নানা কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে এ.এন.আই ইনফোজেন এমপ্লয়িজ সেভ কমিটি গঠন করে। গত ৫ই মার্চ কলেজ স্ট্রীট-এ মহাবোধি সোসাইটি হলে এক নাগরিক কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে এই সেভ কমিটি। এরপর ৯ই মার্চ সেক্টর ফাইভে অফিসের সামনে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীও গৃহীত হয়। ১৮ই মার্চ রাইটার্স অভিযানের পাশাপাশি রাজ্যের শ্রমদপ্তরে অভিযোগ জমা দেন এই তথ্য প্রযুক্তি কর্মীরা। দেশ এবং রাজ্যের সরকার যখন দেখাতে চাইছে যে তারা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে, তখন পরপর সত্যম বা ইনফোজেনের মত ঘটনা আরো একবার দেখিয়ে দিচ্ছে যে মুনাফালোভী মালিকশ্রেণীর চরিত্রটা সব শিল্পেই এক, তাদের রক্ষক সরকার গুলো যা-ই সাফাই গাক না কেন।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার
মজদুর ক্রান্তি পরিষদের সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ই ফেব্রুয়ারী '০৯ কলকাতার রানী রাসমনি রোডে মজদুর ক্রান্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলার ৬-৭টি জেলা থেকে হাজার দুয়েক মানুষ এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সুন্দরবন থেকে আগত কয়েকশ মানুষ অবরোধের কারণে সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে পারেন নি। সমাবশে বক্তব্য রাখেন কমঃ আভাষ মুন্সী, কমঃ বীনানন্দ ঝা ও কমঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন কমঃ অমৃত পৈড়া। সমাবেশে বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে আজকে শ্রমিকশ্রেণী ও সর্বস্তরের নেহনতি মানুষের উপর নেমে আসা আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী সংকোচন-এর মতো হামলাগুলির

শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায়

সত্যম, অ-সত্যম এবং 'সত্যমেব জয়তে'

শংকর দাস

ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানী সত্যম কম্পিউটার সার্ভিসেস-এ ৭,৮০০ কোটি টাকার চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারী সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। অনেকেই এই ঘটনাকে আমেরিকার এন্‌রন্ কেলেঙ্কারীর সঙ্গে তুলনা করছেন। গ্রেপ্তার হয়ে হাজতবাসে রয়েছেন সংস্থার প্রধান বি. রামালিঙ্গম রাজু, তার ভাই— সংস্থার আর এক কর্তা রামা রাজু এবং সংস্থার তৎকালীন অর্থ দপ্তরের প্রধান (সিএফও) শ্রীনিবাস। বাদলামানি গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজুর আর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সত্যম গ্রুপের আর এক কোম্পানী এস. আর. এম. আর হোল্ডিং-এর সাধারণ সচিব ভি. গোপালকৃষ্ণ রাজু। খোঁজ চলছে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সূর্যনারায়ণ রাজুরও। পথে বসেছেন সত্যমের অসংখ্য ছোট শেয়ার হোল্ডাররা। সংস্থার প্রায় চল্লিশ হাজার কর্মচারীর সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। আর প্রত্যাশা মতই অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার, পুঁজিপতিদের সমস্ত বড় বড় পার্টির নেতারা যাদের হাত ধরে রাজু কচু কাটতে কাটতে ডাকাত হয়ে উঠলেন তারা সত্যমের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করেছেন। অন্য ডাকাতরা, রাজুর মত অন্যান্য কোম্পানীর প্রধানরা প্রাণপণে চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন — সত্যম একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

তবে সব থেকে হাস্যকর হিসাবে বোধ হয় পরিগণিত হতে পারে এবারে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণ। রাষ্ট্রপতি সত্যমের ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন এবং সঞ্চয়প্রবণতা, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ, সাধ্যের অতিরিক্ত ধার না করা ইত্যাদি সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন। পরিচ্ছন্ন কর্পোরেট প্রশাসন গড়ে তোলার গুরুত্বও তিনি পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সত্যমের ঘটনা কিন্তু একদিনে তৈরী হয় নি। আর সরকার যতই বোঝানোর চেষ্টা করুক না কেন এটি মোটেই স্রেফ জালিয়াতির একটা ঘটন নয়। এটি হয়ত ঠিক যে রাজু সংস্থার প্রায় ১২ হাজার অতিরিক্ত এবং ভুয়ো কর্মীদের মাইনে বাবদ টাকা নিয়মিত তুলতেন। কিন্তু ঘটনা হলো এই কাজ সমস্ত কোম্পানী নিয়মিত ভাবে করে থাকে। শুধু তাই নয়, কর্পোরেট জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা সম্পর্কে

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ '০৯

আসন্ন পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

ভারতের শাসক দলগুলি লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ছোট-বড় সকলেই এখন জোটের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। বড় দলগুলির যেমন কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজ্যস্তরে ছোট দলগুলিকে প্রয়োজন তেমনি ছোট দলগুলির আবার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ছিটে ফোঁটা পাওয়ার জন্য বা জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকার জন্য বড় দলগুলিকে দরকার।

দেশের প্রধান শাসক দল কংগ্রেস ঘোষণা করে দিয়েছে ভোটের আগে ইউপিএ-র কোন অস্তিত্ব থাকছে না। অর্থাৎ তারা রাজ্য স্তরে যেখানে যেমন সুবিধে হবে তেমন আসন সমঝোতা করবে। আবার নির্বাচনের পরে সুবিধেমত নানান দলকে জুটিয়ে নিয়ে সরকার গড়বে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি অবশ্য এনডিএ জোট নিয়েই নির্বাচন লড়তে চায়। পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে সিপিএম সহ বাম দলগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে যে দূরত্ব বাড়িয়েছিল তা কমিয়ে আনার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে আবার কংগ্রেস-তৃণমূল নির্বাচনী সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার জন্য তৃণমূল নেত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণাও করে দিয়েছেন যে তিনি এনডিএ-তে আর নেই। তার প্রতিদান দিয়েছে কংগ্রেস বিষ্ণুপুর উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থী তুলে নিয়ে। আসনরফা নিয়ে কংগ্রেস তৃণমূল আলোচনাও অনেকদুর এগিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসক দল সিপিএম-এর কাছে এই মুহূর্তে কংগ্রেস ছাড়া ধরবার মতো তেমন কোন খুঁটিও নেই। প্রকাশ কারাত অনেক চেষ্টা করেছিলেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উদীয়মান শক্তি মায়াবতীকে পাশে পেতে। কিন্তু মায়াবতী সাফ সাফ বলে দিয়েছেন যা হবে ভোটের পরে, ভোটের আগে বামেদের সঙ্গে কোন জোট করতে তাঁরা আগ্রহী নন। এককালে মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টি জাতপাতের রাজনীতির জন্য অচ্ছুৎ ছিল বামেদের কাছে। এখন আর নয়। এখন কেউই কারো কাছে অচ্ছুৎ নয়। শাসকদের রাজনীতিতে অচ্ছুৎ বলে কিছু নেই!

তীব্র কংগ্রেস বিরোধিকতার রাজনীতি দিয়েই এরাজ্যে সিপিএম-এর উত্থান হয়েছে। বামপন্থী কর্মীরা কংগ্রেস দলকে, তার রাজনীতিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। এখন কংগ্রেস-সিপিএম অনেক কাছাকাছি। বিশ্বায়নের জমানায় ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতার আশেপাশে ঘোরাফেরা দলগুলির রাজনৈতিক দূরত্ব অনেক কমে গেছে। মুখগুলো সব একইরকম শুধু মুখোশগুলো আলাদা আলাদা। দেশি -বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবা করতে গিয়ে সে মুখোশ প্রায়ই আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রে ত্রন্দ্বত্র আইন প্রণয়ন বা প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে যেমন এনডিএ বা ইউপিএ-র ক্ষেত্রে কোন ফারাক থাকে না তেমনই রাজ্যে রাজ্যে জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে, মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে SEZ গড়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় সিপিএম, উড়িষ্যায় বিজু জনতা দল, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের মধ্যে কোন তফাৎ করা যায় না। জমি অধিগ্রহণ বিরোধী, উচ্ছেদ বিরোধী বা SEZ বিরোধী গণ-আন্দোলনগুলিকে রুখতে একইভাবে পুলিশ ও দলীয় গুণ্ডাদের ব্যবহার করা, ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি শাসক দলের এখন প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ক্ষমতাসীন দল বা সরকার যে কিছুটা জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির বাইরে কোন প্রকৃত বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকার জন্য একদিকে যেমন আন্দোলনগুলি দিশাহীনতায় ভুগছে তেমনই মানুষও শাসক দলগুলির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছেন। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিরা, তাদের বিভিন্ন দল ও প্রচার মাধ্যম বিভিন্ন জনবিরোধী কর্মসূচীকেই জনপ্রিয় করে মানুষকে গেলাতে চাইছে এবং তাদের অন্যতম নির্বাচনী এজেন্ডাও করে ফেলছে।

যেমন সিপিএম দল বা বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে ভালোমতই ধাক্কা খেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা তাদের বামপন্থী ইমেজ ভালোমতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে জনপ্রিয়তাও কমেছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করাই যে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকারের মূল কর্মসূচী তা বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছেও আগের চেয়ে অনেক খোলাখুলি ধরা পড়েছে।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এবারের নির্বাচনে তারা সেইসব কর্মসূচীই জোরেসোরে তুলে ধরতে চাইছে যা তারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে করতে চেয়েছিল। আন্দোলনের চাপে বুদ্ধদেব ভটাটাচার্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'নন্দীগ্রামে আমরা ভুল করেছি'। কিন্তু ভুলটা কোথায় তা তিনি স্পষ্ট করেন নি। আজকে এটা স্পষ্ট যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের কাছে ভুলটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কর্মসূচী রূপায়নে নয়। তাই নন্দীগ্রামে না হোক নয়াচরে কেমিক্যাল হাব নামক ত্রন্দ্বত্র তাঁরা করবেনই। ভুলটা হল নন্দীগ্রামের মানুষকে ম্যানেজ করার পদ্ধতি নিয়ে। শিল্পায়ন এবং উন্নয়নের নাম করে বড় বড় পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের এবং বিপুল মুনাফা করার বন্দোবস্ত করাই সিপিএম বা সরকারি বামেদের কর্মসূচী। বিশ্বায়নের হাত ধরে এদেশে যে সংস্কার কর্মসূচী শাসকশ্রেণী গ্রহণ করেছিল তারই হাত ধরে বন্ধ হয়ে গেছে বহু কলকারখানা— বিশেষ করে যেগুলি শ্রম নিবিড়। কাজ হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। মজুরী কমেছে লাফিয়ে লাফিয়ে, কাজের স্থায়িত্ব কমে গেছে, বেড়েছে কাজের বোঝা। নতুন যে সমস্ত বিনিয়োগ হচ্ছে তাতে বিনিয়োগ অনুপাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে অত্যন্ত কম। কাজ পাওয়ার থেকে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যে সব শিল্প পরিবেশের কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সেইসব শিল্প ভারতের মতো গরীব দেশগুলিতে নিয়ে আসছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি কারণ এসব দেশে পরিবেশ থেকে গরীব মানুষের স্বাস্থ্যের কানাকড়িও মূল্য নেই। কেমিক্যাল হাব তেমনই একটি শিল্প।

বেকার যুবকদের, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী কৃষিনীতিতে বিপর্যস্ত কৃষকদের কর্মসংস্থানের, উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে আজ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কর্মসূচীকেই চ্যাম্পিয়ান করতে চাইছে সিপিএম। এটাই আজ দেশ জুড়ে শাসকদের কর্মসূচী। এখানে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপিকে আলাদা করা যাবে না। বলা বাহুল্য এখানে সিপিএম-এর বিরোধিতা করে কংগ্রেস বা বিজেপি-র সঙ্গে জোট গড়ে যারা পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন আনতে চাইছেন তারা যে পুঁজিপতি শ্রেণীর মৌলিক কর্মসূচীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছেন তা না বললেও চলে। সেইজন্যই আজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলনও ভোটবাক্সে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সার্বিক SEZ বিরোধী বা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী লড়াইয়ে উন্নীত হয় না। এ সীমাবদ্ধতা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের নয়। তাঁরা তো তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছেন, এখনও লড়ছেন। এ সীমাবদ্ধতা নেতৃত্বের।

আজকের অবস্থায় একটি সম্পূর্ণ বিকল্প রাজনীতি, বিকল্প উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। কোন পথে প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে তা কোন পথে মানুষের মত বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে পারে, কৃষি ও শিল্পের বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে কোন ব্যবস্থায়— তা তুলে ধরে সেই চিন্তায় মানুষকে সংগঠিত করা আজ অত্যন্ত জরুরী কাজ ছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় থেকে শুরু করে পস্কো বা রায়গড়ের লড়াইকে সেই বিকল্প লড়াইয়ে উন্নীত করা, সংগঠিত করা এই সময়ের কর্তব্য। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের লড়াইয়ে অগ্রণী সৈনিকদের আজ এই কাজটিকেই হাতে তুলে নিতে হবে। শাসক দলগুলির মধ্যেই বিকল্প খোঁজার যে সস্তা চটকদারী সংসদীয় খেলা তাতে শুধু মুখোষটাই বদলাবে মুখ বদলাবে না। সেই প্রকৃত বিকল্পের বক্তব্য আন্দোলনগুলির মধ্যে, সমাজের মধ্যে উঠে আসছে না বলেই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পরেও সিপিএম বৃহৎ পুঁজির স্বার্থবাহী উন্নয়ন ও শিল্পায়নের শ্লোগানকেই লোকসভা নির্বাচনে মূল প্রচারের বিষয়বস্তু করছে। এটাই আজ দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদের মূল শ্লোগান। শাসক দলগুলির যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন তার মূল শ্লোগান এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

এই সময়ে সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিগুলি একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারতেন। কিন্তু তাদের মধ্যকার একটি অংশের দিশাহীনতা সে কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। মেহনতি মানুষের একটি প্রকৃত বিকল্প বক্তব্য, বিকল্প সংগঠন গড়ে তোলার পরিবর্তে শাসকদের মধ্যকার কোন কোন অংশের সাথে জোট গড়ে তারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নী উন্নয়নের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না।

একটি শক্তিশালী বক্তব্য নিয়ে ক্ষুদ্র শক্তিও যদি মানুষের সামনে উপস্থিত হতে পারে তাহলে সেই শক্তিই পারবে লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে SEZ বিরোধী আন্দোলনের ময়দান পর্যন্ত মেহনতি মানুষের কাছে একটি প্রকৃত বিকল্প হাজির করতে।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

টীকা ভাই, কালিম্পং

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রসার এখন শুধু পাহাড়ে সীমিত না থেকে ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলেও বিভিন্ন চেহারায় হাজির হয়েছে। ১৯৮০-র দশকে এই আন্দোলন ছিল হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত। এবং সিপিএমের বিরোধিতার কারণে ঐ আন্দোলনও শুধুমাত্র পাহাড়েই সীমিত ছিল। এবারের পরিস্থিতি কিন্তু সেরকম নয়। দার্জিলিং -এ সিপিএম সমর্থক আর নেই বললেই চলে। জাতিসত্বার প্রশ্নটিকে নিয়ে জাতিগত বিরোধ তৈরী করার সিপিএমের কৌশল, রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে বলপূর্বক দমন করার সিপিএমের প্রবণতার কারণে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সমস্যার এমন আগ্নেয়গিরি হয়ে রয়েছে যা যেকোন সময় ফেটে পড়তে পারে বলে মনে হয়।

ইংরেজ শাসনের সময় থেকে ভারতীয় গোর্খা জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নিরাপত্তাহীনতার-আত্মপরিচয়হীনতার বোধ, 'স্বাধীন' ভারতে নেহেরু-বল্লভভাই প্যাটেলের গোর্খা জাতি বিরোধী কথাবার্তা, দার্জিলিং-এ গোর্খা জাতিকে সংখ্যালঘু হিসেবে দেখানোর চক্রান্ত, ১৯৭৬-এ মোরারজী দেশাইয়ের গোর্খা জাতি বিরোধী কথাবার্তা— ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দেশের মধ্যে একটা জাতি হিসেবে গোর্খাদের নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্যদিকে জাতিসত্বার রাজনৈতিক পরিচয়ের আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে তুলল। নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক পরিচয় আদায়ের লড়াইয়ের এই দ্বিতীয় দফায় দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবীগুলোও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের অন্তর্বস্তুসমূহের মধ্যে এসে গেছে। একে এক কথায় বিচ্ছিন্নতাবাদ বা উগ্রজাতীয়তাবাদ বলে বিরোধিতা করাটা খুব ভুল হবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচরিত্র এবং তার অন্তর্নিহিত সংকটের সঠিক বিশ্লেষণ না করে, কোন জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিভাবনার পরিচয় না জেনে দেশের অখন্ডতার পক্ষে যান্ত্রিকভাবে ওকালতি করে চলার প্রবৃত্তি সমস্যা সমাধানের বদলে সমস্যাকে গভীরতর করে তোলে। হতে পারে যে পৃথক রাজ্য গঠনের মাধ্যমে দার্জিলিং-এর আমজনতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না, তবু দার্জিলিং-এর মানুষকে আজ পৃথক রাজ্যের দাবী থেকে সরানো যাবে না।

আজ পশ্চিমবাংলার অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী শুধু গোর্খাদের পৃথক রাজ্যের দাবীকে সমর্থন করেননি, তার স্বপক্ষে মুখও খুলেছেন। উন্নত জাতি যদি পিছিয়ে পড়া জাতির মর্মভাবনাকে বোঝার মহত্ত্ব দেখাতে পারে, তবেই আমরা একসাথে পুরো ব্যবস্থাটাকে বদলানোর লড়াইটা একসাথে লড়তে লড়তে এগোতে পারবো। নিপীড়িত জাতিসত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠনগুলি।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায়ের কথা আজ দার্জিলিং-এর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বলে আসছিলো। কিন্তু কিছুদিন হল শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স অঞ্চলের পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ডুয়ার্সের বেশিরভাগ অঞ্চলেই মিশ্রিত জনজাতির বাস। যদিও সংখ্যার দিক থেকে আদিবাসিরাই বেশী, যারা আবার উন্নয়নের নিরিখে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। কিছু সংগঠন ও রাজনৈতিক দল, যারা গোর্খাল্যান্ডের দাবীকে বিরোধ করছে, তারাই ডুয়ার্স অঞ্চলে আদিবাসী ও গোর্খাদের মধ্যে সম্পর্ককে বিনষ্ট করতে, তাদের মধ্যে জাতিদাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল-আরএসপি প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক দল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'কে হাতিয়ার করে নির্বাচনী লড়াইয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। তাই এরা একই সাথে গোর্খাজাতির সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা বলছে, অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বিরোধিতার কথা সজোরে ঘোষণা করছে। ডুয়ার্সের আদিবাসীরা তাই আজ দুই জাতির বিরোধ আর রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থের কাছে পদদলিত হচ্ছে। ডুয়ার্সের আদিবাসীদের তাই নিজেদের মুক্তি ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ভাবার অবকাশ নেই।

আলাদা রাজ্যের প্রশ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্ব সহকারে কোন ভাবনার ছাপ আমরা দেখছি না। বাংলার সমস্ত সংগ্রামী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তাই এই বিষয়ে আরো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে ভ্রান্ত দিশায় চালিত করার রাজ্য সরকারের বিপজ্জনক অপচেষ্টার কারণে উত্তরবঙ্গে যেকোন সময় জাতিগত হিংসার মত খারাপ পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সে ছড়িয়ে থাকা এই টানটান বাতাবরণ ও পাহাড়ের যুবসমাজের মধ্যে দিনদিন বেড়ে চলা হতাশা আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মক দিকেও নিয়ে চলে যেতে পারে। শবদেহ আর শ্মশানের উপর বসে ক্ষমতার স্বাদ নেওয়ার মত ফ্যাসিস্ট অরাজকতাকে আর কতদিন বহন করে চলবে পশ্চিমবঙ্গ?

মজদুর ক্রান্তি পরিষদের সমাবেশ

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বিরুদ্ধে কলে কারখানায় আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এছাড়া আজ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের হাত ধরে যেসব হামলা দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা শুরু করেছে, SEZ প্রকল্প, জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলনগুলিকে সর্বভারতীয় স্তরে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়। কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম-এর মতো শাসক দলগুলি আজ উন্নয়ন বা শিল্পায়নের নাম করে যে কর্মসূচী নিয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কার্যক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর বিপরীতে মেহনতি মানুষের এক বিকল্প উন্নয়নের ভাবনা সমাবেশে তুলে ধরা হয়। মেকি বামপন্থার বিপরীতে এক সাচ্চা সংগ্রামী বামপন্থার রাজনীতিকে আজ সমাজে তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে। এর জন্য সংগ্রামী বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর জন্য সংগ্রামী বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কখনোই মেহনতি মানুষেব কাছে বিকল্প হতে পারে না। কারণ সে নীতিগতভাবে পুঁজিবাদের পক্ষে। নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করলেও এইদল সামগ্রিকভাবে SEZ আইন ও SEZ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কথা বলে না, শালবনিতে জিন্দালদের SEZ-এর বিরুদ্ধে এই দল কোন কথা বলে না। ৩৫৬-র মতো অগণতান্ত্রিক ধারার পক্ষে সওয়াল করে। এই দল যে বক্তব্য রাখছে তার সমালোচনাও সমাবেশে করা হয়।

এর আগে গত ১৭-১৮ জানুয়ারী হুগলীর উত্তরপাড়ায় মজদুর ক্রান্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলার প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শহিদবেদীতে মাল্যদান এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সংগঠনের অবস্থান ও সাংগঠনিক নিয়ামবলী, নির্বাচন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ও বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত দলিল গৃহীত হয়। এছাড়াও সমসাময়িক বেশ কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে ৩৮ জনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও ১১ জনের একটি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। সর্বসম্মতভাবে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন বীনানন্দ ঝা এবং অমিতাভ ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পুঁজিবাদের এই আধিপত্যের সময়ে মেহনতি মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মজদুর ক্রান্তি পরিষদের এই সম্মেলন এবং সমাবেশ নিঃসন্দেহে আশার সঞ্চার করে। আগামী দিনে কলে কারখানায় এবং গ্রামে-গঞ্জে সব ধরনের মেহনতি মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিষমদে মৃত্যু—আসলে কে দায়ী?

সুশান্ত বোস

২০০৯-এর জানুয়ারী মাসে এরাজ্যের কলকাতা বন্দর এলাকা, নিউমার্কেট, বজবজের মহেশ তলায় বিষমদ খেয়ে ৪০-৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। কারা এই বিষমদের শিকার? কলকাতা বন্দর এলাকার বিবি হলের গোপাল জসওয়াল জোগাড়ের কাজ করতেন। ট্রাক-ড্রাইভার সরোজপ্রসাদ বছরের অর্ধেকেরও বেশিদিন কর্মহীন থাকতেন। বেদী কুমার হরজন, পেশায় গাড়ির হেল্পার। অর্থাৎ আমাদের সিভিল ও সভ্য সোসাইটির নিম্ন আয়ের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষেরাই বিষমদে (চোলাই) মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার। এরা যে পরিবারে কারও স্বামী, কারও বাবা, কারও ছেলে — সেই পরিবারগুলি রোজগেরে লোকদের হারিয়ে আজ আরও গভীর সংকটে পড়েছে। খাবার জুটবে কোথা থেকে, কি কাজ করব, কে কাজ দেবে — এই সমস্ত প্রশ্ন পরিবারগুলির মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা এসব ছাইপাশ খায় কেন? ঠিক এই একই প্রশ্ন সিপিএম নেতা শ্যামল চক্রবর্তীও করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ওরা সরকারি দোকান থেকে মদ না কিনে বেআইনি চোলাই খেয়েছে বলেই মারা গেছে। এ যেন সেই ফরাসী রাণীর মতো প্রশ্ন— "ওরা রুটি পায় না তো কেক খায় না কেন?" এবং মেহনতী মানুষের সরকার এরপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছে — রাজ্যে আরো বেশি করে দেশি মদ উৎপাদন করা হবে, আরো সরকারি মদ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং সরকারি খুড়ি দেশি মদের দাম কমানো হবে যাতে তা রাজ্যের গরীবগুলোর হাতে সহজেই পৌঁছাতে পারে। সরকারি সমীক্ষাতেই জানা যাচ্ছে, এরাজ্যে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১ কোটি লিটার দেশি মদ বিক্রি হয় সেখানে চোলাই বিক্রি হয় প্রায় তিন কোটি লিটার। আর বিক্রি হবে নাই বা কেন? ৩০ মিলি. দেশি মদের দাম যেখানে ২২ টাকা সেখানে মাত্র পাঁচ টাকাতেই এক প্যাকেট চোলাই মেলে। তাই রাজ্যের মুটে, মজুর, ভ্যান রিক্সা-ট্যাক্সি চালক, ইটভাটার শ্রমিক, দিনমজুর এরা চোলাই খাবে নাতো কি দেশি মদ খাবে? এদের ট্যাকে যদি সে জোর থাকত তবে তো তারা শহরে বাবুদের মতো ক্লাবে গিয়ে চেয়ারে বসে দেশি-বিদেশি গিলত। তাই বেআইনি চোলাই খেয়ে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তাতে সরকারি কর্মকর্তাদের (আবগারী দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন) কোনো দায় নেই। আর এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য রাজ্যে বেশ কিছু বেআইনি চোলাই-এর ঠেক ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং কম দামে আরো বেশি দেশি মদ বিক্রির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চোলাই মদ নিয়ে আলোচনার এখানেই ইতি টানা যেত। কিন্তু তা করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ বেশ কিছু প্রশ্ন সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে উঠে আসছে। যেমন, সরকারের নাকের ডগায় দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ধরে বেআইনি চোলাই-এর ঠেক চলছে কি করে? সরকার এতদিন কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি? সোদপুর স্টেশন থেকে পুব দিকে সোদপুর রোড ধরে সোজা এগোলে তালবান্দা পুলিশ ফাঁড়ির পরেই শুরু হচ্ছে বেআইনি চোলাই তৈরীর ঠেক। মধ্যমগ্রামের লেনিনগড়ের গা বরাবর খাল ধারে দিনরাত জ্বলছে রাবণের চিতা, আকাশ কালো করে ধোঁয়া উড়ছে আর তৈরী হচ্ছে হাজার হাজার লিটার চোলাই মদ। রাস্তার ধারে আলুকাবলী বিক্রেতা জানালেন, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এরকম চলছে। পাশেই সিপিএম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ বসুর বাড়ি। নিউব্যারাকপুর পুরসভা (যার অন্তর্গত লেনিনগড়) এবং বিলকান্দা ১ ও ২ গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকাতেই রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও বেশি চোলাই-এর ভাটিখানা। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, শাসকদলের অনেক নেতারই পরোক্ষে পয়সা খাটে এই ভাটিখানাগুলিতে। আর ভাটিখানার উল্টোদিকের দেওয়ালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখন। প্রতিবার নির্বাচনের আগে নিয়ম করে ভোটের প্রচার করতে এসেছেন। আবার প্রচার শেষে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ফিরেও গেছেন। প্রশ্ন তোলাই যায়, এতদিন তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি কেন? আসলে এই ৩১ বছর ধরে সিপিএম এ রাজ্যে শুধু ভোটের রাজনীতিই করে গেছে। এখানেই চোলাই মদ তৈরীর কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে যুক্ত প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ। প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে এই চোলাই তৈরী বা কেনা বেচার কাজে। এখান থেকে তৈরী হওয়া চোলাই জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই হয়। গৌড় এক্সপ্রেস, লালগোলা, বনগাঁ লাইন ছাড়াও নৈহাটি হয়ে বর্ধমান বাঁকুড়া, বীরভূম ভায়া ব্যান্ডেল সংক্ষেপে এই হল সাপ্লাই লাইন। ফলে ভোট খোয়ানোর ভয়ে সিপিএম সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও চোলাই মদের কারবারীদের ঘাঁটায় না। এখন এত লোকের মৃত্যুতে তারা পুলিশ দিয়ে কিছু ঠেক ভেঙে দিচ্ছে, আর পাড়ার সিপিএম নেতারা যুক্তি দিচ্ছেন "এটা সামাজিক ব্যাধি। জনসাধারণকেই দলবদ্ধভাবে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।" কিন্তু একথার মধ্য দিয়ে সরকার তার দায় থেকে সরে আসতে পারে না। রাজ্যের আবগারী দপ্তরকে সক্রিয় করতে কোনো ভূমিকাই নেয়নি রাজ্য সরকার। আসলে সকল শাসকদলের মতো এরাজ্যের তথাকথিত বামসরকারও রাজ্যের বৃহৎ অংশের মানুষকে চোলাই মদ, অনলাইন লটারী, ইত্যাদির মধ্যেই ডুবিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

লালগড়

জনসাধারণের কমিটির জনসভায় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলনকে সমর্থন জানালো লালগড় ভিত্তিক 'পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী, লালগড়ের রাবনপুলা মাঠে, জনসাধারণের কমিটি আহূত জনসভায় বক্তব্য রাখলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি এবং অন্যতম নেতা বিনয় তামাং। মোর্চার পক্ষ থেকে লালগড়ের আদিবাসী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় এবং ছত্রধর মাহাতো, সিধো সরেন সহ আন্দোলনের নেতৃত্বকে পাহাড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। টেলিফোনের মাধ্যমে বক্তব্য রেখে লালগড়ের আদিবাসী আন্দোলনকে সমর্থন জানান গোর্খা নেতা বিমল গুরুং। গোর্খা নেতারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন আদিবাসীদের সঙ্গে গোর্খাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। চা-বাগানে গরীব আদিবাসী এবং গোর্খারা দীর্ঘদিন ধরেই একসাথে চা-শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছে। আজ সিপিএম সেই ঐক্যকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

অন্যদিকে 'জনসাধারণের কমিটি'-র পক্ষে ছত্রধর মাহাতো বলেন, 'গোর্খাদের সঙ্গে আদিবাসীদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। উত্তরবঙ্গে 'আদিবাসী পরিষদ' কিম্বা পশ্চিম মেদিনীপুরে 'গণপ্রতিরোধ কমিটি' তৈরী করে পেছন থেকে সিপিএম-ই সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভুতুড়ে সংগঠনগুলির না আছে কোন নীতি না আছে কোন নেতৃত্ব।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিরা ছাড়াও এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা থেকে যাওয়া কবি সব্যসাচী দেব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠক অনুজিৎ চক্রবর্তী, লেখক পাঁচু রায় ও আরও অনেকে।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী লালগড় ব্লকের খাসজঙ্গল গ্রামে সিপিএম-এর হার্মাদ ও পুলিশের গুলিতে নিহত রাজারাম মান্ডি, লখিন্দর মান্ডি ও গোপীনাথ সরেনদের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা করে এবং পরিবারের একজন করে চাকরি, আহতদের ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। লক্ষণীয়, জনসাধারণের কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রথম উন্নয়ন প্রশ্নে ৯ দফা দাবি জানানো হল। এতদিন তাঁরা বলেছিলেন পুলিশি সন্ত্রাস সংক্রান্ত দাবিগুলি মিটিলে পরে উন্নয়নের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করবেন। যদিও আন্দোলন কিছুটা এগোনর পর থেকেই আদিবাসীদের প্রতি শোষণ বঞ্চনার নানা দাবি সাধারণ মানুষের বক্তব্য থেকে বা মিডিয়ার অনুসন্ধান থেকে উঠে আসছিল কিন্তু জনসাধারণের কমিটি সরাসরি এর আগে নির্দিষ্টভাবে উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনোও দাবি জানায়নি।

জনসাধারণের কমিটির উন্নয়ন প্রশ্নে দাবিগুলি হল—

১। সাঁওতালী ভাষায় "অলচিকি" অক্ষরে প্রাথমিক স্তর থেকে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠন আগামী ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করতে হবে।

২। সাঁওতালী ও কুড়মালী সহ সমস্ত আদিবাসী ভাষায় ২৪ ঘণ্টা রেডি ও এবং টি.ভি. সম্প্রচার চালু করতে হবে।

৩। বিনামূল্যে সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের চাষযোগ্য জমি দিতে হবে।

৫। জঙ্গলের ১০০ ভাগ অধিকার আদিবাসী ও জঙ্গলখণ্ডের মানুষদের দিতে হবে।

৬। এলাকার কর্মপ্রার্থী সবাইকে ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে।

৭। প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং প্রতিটি পঞ্চায়েতে হাসপাতাল করতে হবে।

৮। প্রত্যেক ত্র.ট্র.ঙ্গত্রর.ঙ্গখচ্চ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বুকগ্রান্ট ও ভরনপোষনের টাকা দিতে হবে। ইচ্ছুক সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারিভাবে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। এলাকার প্রতিটি গ্রামে আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে হবে।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (সোরেন) দল এবং 'অল ইন্ডিয়া SC/ST ফোরামের' প্রতিনিধিরা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ন্যাশনাল জুটমিলের শ্রমিকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ১০ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল জুটমিলের শ্রমিকরা স্থানীয় চাঁপাতলা মোড়ে পথ অবরোধ করলেন। এক্সট্রা ক্যাজুয়্যাল শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, পেনশন এবং ন্যাশনাল জুটমিলকে পুনরায় চালু করার দাবিতে প্রায় শ দুয়েক শ্রমিক এদিন পথ অবরোধ করেন। ন্যাশনাল জুটমিল ছিল একটি সরকারি মিল। কিছুদিন আগে সরকার শ্রমিকদের দ্দত্মত্র দিয়ে কারখানা থেকে বের করে দেয় এবং কারখানার গেটও বন্ধ করে দেয়। প্রতিপক্ষের প্রাথমিক ঘোষনা ছিল মিলের সমস্ত শ্রমিকদেবদ্দত্মত্রদেওয়া হবে। এই মিলের একদল বদলি শ্রমিক ছিলেন যাদের বলা হত এক্সট্রা ক্যাজুয়্যাল। কর্তৃপক্ষ এই শ্রমিকদের দ্দত্মত্র বা কোনরকম ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। এরই প্রতিবাদে শ্রমিকরা পথে নামেন। গত কয়েকমাস ধরেই শ্রমিকরা নানান্ আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে চলেছেন। এদিকে সরকার কিনিসন এবং খড়দহ জুটমিলকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। স্বভাবতঃই ন্যাশনাল জুটমিলের শ্রমিকরাও প্রশ্ন তুলেছেন এত ভাল পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এই মিলটি পুনরুজ্জীবিত করা হবে না কেন?

ঘণ্টা দুই অবরোধ চলার পর সাঁকরাইল থানার ও. সি. ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে শ্রমিকদের বৈঠক হয়। এই আন্দোলনের, বীনানন্দ ঝা জানিয়েছেন, ম্যানেজমেন্ট প্রথমে এক্সট্রা ক্যাজুয়্যাল শ্রমিকদের শ্রমিক বলেই স্বীকার করতে চাইছিল না। তীব্র বাদানুবাদের পর ম্যাজেমেন্ট একথাও মৌখিকভাবে স্বীকার করে যে তারা প্রথম নোটিশে মিলের সমস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের নোটিশ দিয়েছিল। একথা স্বীকার করলেও এক্সট্রা ক্যাজুয়্যালদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ম্যানেজমেন্ট দেয়নি। তিনি বলেন, 'আমাদের আরও বড় ধরনের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার চালচিত্র

সরকার প্রতি বছরই ঘটা করে কৃষিপণ্যের দাম নির্দ্ধারণ করে থাকে। কখনও পাটের কখনও গমের বা ধান ইত্যাদির।

২০০৮ সালে নানান ধ্বংসের পূর্বাভাস পাবার সময় সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব খাদ্য সংকটের চিত্র যখন ফুটে ওঠে তখন মার্কিন প্রশাসনের চাপে ভারতীয় জনগণের বিরোধিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রূপায়ন করা হয় ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণুচুক্তি, অন্যদিকে কৃষকদের (!) মন যোগানোর জন্য ধানের সরকারি ক্রয়মূল্য ঘোষণা করা হয় এক হাজারের কিছু বেশি টাকা (কুইন্টাল প্রতি)।

কৃষি পণ্য সরকারি দামে কেনার চালচিত্রে কেন "অসামরিক" পরমাণু চুক্তির প্রসঙ্গ এল সে বিষয়ে উক্ত ক্ষেত্রে বিতর্কের (লোকসভায়) সময় রাজীব তনয় রাহুল গান্ধীর বক্তব্য স্মরণ করুন। ভারতবর্ষের গণ্ডগ্রামের কলাবতী-লীলাবতীরা কেন তাঁদের সন্তানদের 'মানুষ' করতে পারছেন না? কারণ পরমাণু বিদ্যুৎ নেই, তাই!

এ ধরনের ভুবনায়নে বিশ্বাসী ত্রিকাল পারমানবিক আলোর ভক্ত সাংসদকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে ধানের ক্রয়মূল্য এক হাজার থেকে কমিয়ে নয়শো টাকা করবার পর ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের ধান অভাবী বিক্রির পর যখন বেনফেড, কনফেড-এর মাধ্যমে নয়শো টাকা সাইন বোর্ডে লিখে ধান কিনতে শুরু করল, তখন সত্যিকার কৃষকরা ফোড়েদের কাছে ৬৫০.০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বেচতে বাধ্য হচ্ছেন কেন?

উত্তর হয়তো পাবেন রাহুল গান্ধীর কাছ— থেকে ভারতে ঠ্ঠ.চ.চ অত জোড়ালো ভাবে আসেনি তাই।

যে ভূমিকাটি উপস্থাপিত হল তার সমর্থনে এবার চালচিত্রটি হাজির করি।

জুল্লুর রহমান তার আত্মীয়ের সাথে গল্প করছেন

কালদিঘি হিম ঘরে ৯০০ টাকা কুইন্টাল ধান কেনেছে। দেখি আজবন লাইন পাওয়া যায় কিনা।

আত্মীয় ধান তো কেনছে সোমবার থেকি। মুঁই বুধাবার খবর পাই নিয়া গেনু আজকা মিলের কাঁটাত হাত পা ধরি তিনশো টাকা (৪৫ কেজি ৫০০ গ্রাম) মন দিনু।

আত্মীয় কেনে হাতপাতালের ওটিও তো সরকারি কাঁটা বসিছে।

জুল্লুর ওটি যাই পাত্তা পাবেন! ছোট খাট ন্যাতাগুলাক্ ছুট আস করি দেছে। রাতোতে গোডাউন বোঝাই ধানের লাইন দেখিছেন! এই শীতোত কয় রাত থাকিবেন।

আত্মীয় কেনে তোমার বেটগুলাক।

জুল্লুর আরে বাপু ধান তো কেনেছে কিন্তু তামান নেতাদের। কামাই করি বন্যাছে কিছুটা।

আত্মীয় আর তোমার গাঁয়েরটা।

জুল্লুর ওটি বলে বেশি কিনবিনা। ২০০ কুইন্ট্যাল কিনার কথা... রতন এক রাতে ২০ হাজার কামাই করিছে।

আত্মীয় আসলে যারা ভোটোৎ পাইসা দিছে তারা এই সুযোগে পাইসাটা তো ওঠাবি! আলু তো লস্ গেল।

জুল্লুর ঐলা কথা থাক বাপু... একটা জিনিস দেখা গেল, যে কোন পার্টির মস্তান না হবা পালে তোরা কিছুই করবা পারবেন না ধান বেচি সুদ সুদের পাইসা গুলা দেওয়া গেল এখন কামা করি...। সরকার যতই হামার ভাল করবা চাক্ লাভ করছে পার্টিগুলার মাস্তান, অফিসার আর মিল-আলারা। শুনিছেন! মিল নাকি তামান ধান সরকারি রেটে-এ কিনিছে। এই হল দক্ষিণ দিনাজপুরে সরকার মূল্যে বেনফেড কনফেডের ধান কেনার বাস্তব চিত্র। এখানকার সরকারি এবং প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলির কর্তাব্যক্তিরা মুনাফা ছন্নছাড়া। হবার ব্যাপারে কোন আপস বা নমনীয় মনোভাব নেয়নি। বরঞ্চ মুম্বই হানার অব্যবহিত পরে ক্রিকেটকর্তা দিলীপ ভেঙ্গ সারকারের দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ধান-সংগ্রহের স্থানের আশেপাশে গরীব গুর্বো কৃষকদের ভীড় বাড়তে দেয়নি।

অন্তবর্তী বাজেট সমীক্ষা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ হলো অন্তবর্তী বাজেট। যেহেতু সামনে আর চার মাসের মধ্যেই লোকসভা ভোট এবং তারপর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসবে তাই এই সময়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ না করাই হলো প্রথা। অন্তবর্তী বাজেটে আগামী চার মাসে সরকার কি ধরনের আয়-ব্যয়ের মধ্য দিয়ে যাবে তাই স্থিরীকৃত করেছে। সুতরাং এই বাজেট ঘিরে আশা-প্রত্যাশার পারদ যে খুব বেশি চড়বে না এটাই স্বাভাবিক। তাই অন্যান্য বছরের মত এবারের বাজেট ঘিরে খুব একটা উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় নি। আর অংশত সেই সুযোগে এবং অংশত বর্তমান ভারতে ক্রমবর্ধমান গতিতে সংসদকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে পেছনের দরজা দিয়ে কাজ হাসিল করার যে প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে তার ধাক্কায় অন্তবর্তী বাজেটে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে শূন্যগর্ভ কিছু কথার ফুলঝুরি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাজেট তাই বাজে কাগজের একটা বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুঁজিপতি-বিনিয়োগকারীরা অখুশী

কিন্তু এসময় অন্য সময়। মন্দার ধাক্কায় শিল্প কুপোকাৎ। ব্যাপক পরিমাণ সরকারি সাহায্য ছাড়া অধিকাংশ বিখ্যাত ম্যানেজমেন্ট গুরুদেরই দেউলিয়া হয়ে যাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে সরকারি পয়সার ভাণ্ডার দিয়ে ক্রমাগত কেরোসিন জুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে নামজাদা সংস্থাগুলিকে। ভারতও খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং সমস্ত শিল্পপতি, বিনিয়োগকারীদেরই আশা ছিল বাজেটে তাদের জন্য কিছু উপহার থাকবে। হোক না অন্তবর্তী বাজেট। এখন তো এক একটা দিন পার করাই সমস্যা। কিন্তু বাজেট পেশের দিন সকালেই কি করে যেন রটে গিয়েছিল — বাজেটে কিস্যু নেই। সুতরাং স্টক এক্সচেঞ্জ খোলা মাত্রই শেয়ার বাজার পড়তে শুরু করল। তখনও বাজেট পেশ হয় নি। এরপর প্রণববাবু সংসদে যতই আবেগ সহকারে ইউপিএ সরকারের মহিমা কীর্তন করতে করতে বাজেট পড়তে থাকলেন, অন্যদিকে ততই পাল্লা দিয়ে বাজার পড়তে থাকল। বাজেট পড়া শেষ করে প্রণববাবু আবিষ্কার করলেন শেয়ার বাজার ৩২৯ পয়েন্ট পড়ে গিয়েছে।

ইউ বি গ্রুপ এবং কিং ফিশার বিমান সংস্থার চেয়ারম্যান বিজয় মালিয়া সখেদে মন্তব্য করেছেন যে একদিকে সরকার বলছে যে সরকারী ব্যাংকগুলির হাতে তরল অর্থের অভাব নেই। এদিকে এমন কিছু করা হল না যার মধ্য দিয়ে শিল্পগুলি ছাড় পায়, বাজার পায় বিশ্বাস এবং ক্রেতারা বেশি করে কেনাকাটা করার জন্য পায় কিছু অতিরিক্ত পয়সা। টিভিএস মোটর কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভেনু শ্রীনিবাসন বাজেটে বরাদ্দকৃত্য অর্থের সময়োপযোগী ব্যয় নিয়ে সরকারি অপদার্থতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন গত বছর বাজেটে পরিকাঠামোতে যে পরিমাণ সরকারি বরাদ্দ ছিল তা এখনও খরচ করা হয়নি। এটা করা হলে বাজারে অর্থের সঞ্চলন বাড়ত। তার ধাক্কায় বাড়ত ক্রয়ক্ষমতা।

অন্যদিকে ঠিক এই সময়েই ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পতন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। মন্দার ধাক্কায় রপ্তানি শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে আর মুদ্রা বিনিময় হারের নাটকীয় পতনে (১ ডলারের দাম ৫০ টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে) আমদানি শিল্প প্রায় চোরাবালিতে। দেশের আমদানি রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগকারীরা সরকারের মুখ চেয়ে বসে ছিল। অন্তবর্তী বাজেট তাদের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। একই অবস্থা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের। এদিকে সরকার বলছে, আরে, নির্বাচনের সামনে কেউ খোলাখুলি শিল্পপতিদের পক্ষে দাঁড়ায়? ২০০৪-এ বি.জে.পি.-র কি হয়েছিল মনে নেই?

শ্রমিকরা অখুশী

চলতে থাকা মন্দার ধাক্কা সব থেকে বেশি পড়ছে শ্রমিকদের ঘাড়ে। অলঙ্কার শিল্পের সঙ্গে জড়িত এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এই মুহূর্তে কাজ হারা। গুজরাটে শুধুমাত্র হীরে শিল্পেই ২ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন। গত দুমাসে তারা একে একে ঘরের জিনিসপত্তর বেচে সংসার চালিয়েছেন। এবার শুরু হয়েছে কিডনী এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেচার পালা। ইতিমধ্যে ২ জনের আত্মহত্যার খবর এসেছে। মুম্বাইয়ের স্বর্ণশিল্পের অবস্থাও একই। অলঙ্কার শিল্পের পাশাপাশি চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, হোটেল ব্যবসা, লৌহ ইস্পাত শিল্প, অটোমোবাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং সর্বত্রই শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন। মাইনে পাচ্ছেন না। ধীরে ধীরে বাড়ছে অনাহার, অর্ধাহার। অন্তবর্তী বাজেটে কাজ হারানোর এই মিছিল নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। অথচ বাজেটে যে শব্দটি সব থেকে বেশি বার ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো 'আম-আদমি'! এই আম-আদমি যে কারা, কোন বায়বীয় জগতে তার অবস্থান — এ ধোঁকাবাজী বোঝা দুঃসাধ্য।

সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলি যেমন একশো দিনের কাজ, সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে মিল, জওহরলাল নেহরু আরবান রিনিউয়াল মিশন, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আসল সত্য হল এই যে চলতি অর্থবর্ষের ব্যয় বরাদ্দের আদি প্রস্তাব থেকে তা বাড়লেও, চলতি অর্থবর্ষের যে সংশোধিত বরাদ্দ তার থেকে তা কম। এমনিতেই ভুক্তভোগী মানুষ জানেন যে এই সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবে কি ভাবে চলে। একশো দিন প্রকল্প তো এমনিতেই বছরে ১৪-১৫ দিনের বেশি কাজ দিতে পারে না। তার ওপর তা নিয়েও যদি নিরন্তর ধোঁকাবাজী চলতে থাকে তাহলে অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সরকার নিশ্চুপ থেকেছে ব্যাপক পরিমাণ বাজেট ঘাটতি নিয়ে যা ইতিমধ্যেই দেশের জাতীয় আয়ের ১৩.৫ শতাংশ-এ গিয়ে পৌঁছেছে। যার অনিবার্য পরিনাম হল সামগ্রিক অর্থনীতি এবং শেষ পর্যন্ত দেশের আম-আদমির ওপর প্রবল চাপ বৃদ্ধি। এই পয়সা কোথা থেকে আসবে সরকার এই প্রশ্নে মুখ খোলে নি। টাকা ছাপিয়ে যদি এই অর্থের যোগান দেওয়া হয় তাহলে ঘটবে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধি, আর যদি বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয় তাহলে বাড়বে সুদের বোঝা। ভোগান্তি কিন্তু জনগণেরই। এদিকে অর্থমন্ত্রকের খবরে দেখা যাচ্ছে যে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে চাঙ্গা এবং শক্তিশালী করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির হাতে যাতে পর্যাপ্ত পয়সার যোগান থাকে তার জন্য সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে চার বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা) ধার নিচ্ছে। এই টাকা ১১টি সরকারি ব্যাঙ্ক-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এই তালিকায় রয়েছে ইউকো ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, আই.ডি.বি.আই ইত্যাদি। কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে লোককে বিচার কর — এই প্রবাদ মেনে চললে দেওয়াল লিখন পরিষ্কার।

যুদ্ধবাজরা খুশি

কিন্তু খুশি হয়েছে আমেরিকা, ইজরায়েলের যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থাগুলো। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই প্রথম প্রতিরক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ এত বিরাটভাবে বাড়ানো হলো। গত বছর প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছিল ১০ শতাংশ। আর এ বছর বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। গত বাজেটের থেকে ৩৬ হাজার ১০৩ কোটি টাকা বেড়ে ২০০৯-২০১০ আর্থিক বছরের প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হলো ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা। এই বাজেটে বরাদ্দের একটা বড় অংশ জুড়েই থাকছে নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র কেনার পরিকল্পনা। ইজরায়েলের কাছ থেকে এক বিরাট পরিমাণ অস্ত্র কেনা হবে বলে সরকার ঠিক করেছে। ৫০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে কেনা হবে ১২৬ টি যুদ্ধ বিমান। আমেরিকার বোয়িং কোম্পানি এই বরাত পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মানকারী সংস্থাগুলো স্বাভাবিকভাবেই উল্লাসিত।

কালা কানুন 'পোটা'-কে নব কলেবরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ইউ. পি. এ সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এই মর্মে যে বিল সংসদে পাশ করিয়েছে সেই আইনে যে 'জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা' গঠিত হয়েছে তার জন্য এই বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর জন্যও বরাদ্দ ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্তবর্তী বাজেট সাধারণ মানুষকে একদিকে যেমন কিছুই দিয়ে উঠতে পারে নি তেমনি অন্যদিকে খোলাখুলি পুঁজিপতিদেরও দেদার উপঢৌকন বিলোতে পারে নি। বাজেট বিতর্ক চলাকালীন হঠাৎ করে উৎপাদন শুল্ক আরও দুই শতাংশ কমিয়ে পুঁজিপতিদের একটা সংকেত দিয়ে রাখা হয়েছে। ভোটটা মিটে যেতে দাও, তারপর দেখছি। সুতরাং ভোটের বছরে সরকার একটা ব্যালান্সের খেলা খেলতে হয়েছে।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সশস্ত্রীকরণের একটা ঝোঁক কিন্তু খুব স্পষ্ট আকারে বাজেটে উঠে এসেছে। আমাদের মতো দেশগুলিতে যুদ্ধ উন্মাদনা এবং এই সশস্ত্রীকরণের ঝোঁক, আর তার সাথে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল বাজেট বরাদ্দ ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে কতটা সাহায্য করবে তা বলা মুশকিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই প্রবণতা ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িয়ে তুলবে অস্থিরতা এবং গণতন্ত্রের সংকোচন।

সবার জন্য সরকারি চিকিৎসার দাবীতে কান্দীতে গণমিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সব মানুষের জন্য বিনা খরচে সমস্ত ধরণের চিকিৎসা পরিষেবা সরকারী হাসপাতাল থেকে দেওয়ার দাবীতে কান্দী মহকুমা হাসপাতালে গণমিছিল সহ একটি ডেপুটেশন পেশ করা হয়। মহকুমার কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ভরসাস্থল কান্দী মহকুমা হাসপাতালটি অন্য জায়গার মতই ক্রমশ স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ছে। একদিকে ভ্রান্ত সরকারী নীতি, অন্যদিকে সরকারী বেতনভুক একশ্রেণীর ডাক্তার থেকে স্বাস্থ্যকর্মীর লোভ ক্রমশ ইন্ধন জোগাচ্ছে বেসরকারী চিকিৎসাকে, নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে সরকারী হাসপাতালের বহু মুল্যবান যন্ত্রপাতি।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটির ডাকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বহু মানুষ। মিছিল থেকে দাবী ওঠে—হাসপাতালের বেড বাড়ানোর, জরুরী ভিত্তিতে জরুরী অপারেশন করার, শিশুদের অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনার, অনুসন্ধান বিভাগ ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার, আইসিইউ বেডের ব্যবস্থা, ফিজিও-থেরাপির যন্ত্রপাতিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, হাসপাতালকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখা সহ বিশ দফা দাবী।

কান্দী হাসপাতালকে কেন্দ্র করে বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থার দাবীতে লড়াই চালিয়ে আসছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটি।

কর আদায়কারীরা কি খান?

বেসরকারী কাজে নানা ধরনের মাইনের এবং ব্যবস্থার কর্মচারী থাকে সবাই জানেন। যেমন উৎপাদন ভিত্তিক কাজ যেখানে হয় যেমন কল-কারখানায় — সেখানে স্থায়ী, স্পেশাল বদলী, বদলী জিরো নাম্বার ইত্যাদি। সেখানে অন্তত বেতনে ততটা বৈষম্য এতদিন ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু নতুন অর্থনীতির যুগ সেজন্য সমান কাজ করলেও চুক্তির ভিত্তিতে বেতনের নানা ধাপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সরকারি চাকুরিক্ষেত্রেও যে এরকম অনেক বৈষম্য আছে তা অনেকের অজানা। ডাক কর্মচারীদের বারবার ধর্মঘটে দেশের মানুষ কিছুটা জেনেছেন যে ডাক কর্মচারীদের বৃহদংশ হলেন 'এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল'। অর্থাৎ যতদিন চাকুরি আছে ততদিন (বর্তমান অবস্থায়) সর্বোচ্চ তিন হাজারের কাছাকাছি বেতন পাবেন। চাকুরিতে অবসর নিলে আর কিছু মিলবে না। এরকমই একটি দপ্তরের কথা আজ বলব যার কর্মচারীরা প্রচণ্ড দায়িত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত। কিন্তু সেই কাজ করে সংসারের ভরণপোষণ তারা করতে পারেন না। সরকারি কর্মচারী তারা নামেই। কিন্তু বাস্তবে ঠিক কি সেটা সম্ভবত তাদেরও বোধের অগম্য!

এদের দপ্তরের নাম কি? ৮০-৮১ সাল থেকে কাজ করা বয়স্ক মানুষটি বলতে পারলেন না। তাদের সই করা যে কাগজটি ছাড়া বহু জায়গায় আবেদনপত্র পাঠানো যায় না সেই কাগজটি দেখিয়ে বললেন — 'আমরা হলাম গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর আদায়কারী'। বেতন কত পান? উত্তরে বললেন — আমি ৮০-৮১ সালে মাসে ২০ টাকা সাম্মানিক পেতাম। তারপর সেটা বাড়তে বাড়তে এখন ২০০ টাকা হয়েছে। আর যা আদায় করি তার ১৫ শতাংশ কমিশন। আদায় কত করেন? আদায় গড়ে ৩০-৩৫ হাজার টাকা হয়। এদিক থেকে আসে সাড়ে চার-পাঁচ হাজার টাকা। আর সাম্মানিকটা কিন্তু প্রতি মাসে আসে না। চার-পাঁচ বা তারও বেশি বকেয়া পড়ে থাকে। আপনাদের নির্দিষ্ট অফিস আছে? না, এই পঞ্চায়েতের অফিসেই থাকতে হয়। কারণ যদিও আমরা অঞ্চলের প্রতিটা লোকের বাড়িতে যাই কিন্তু সব সময় তো মানুষের হাতে টাকা থাকে না, তাই তারা এই ঠিকানায় আসে। এখানে না পেলে তারা বিরক্ত হয়।

প্রশ্ন করি ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরে যারা খাজনা তুলতেন তারা এবং তাদের সহকারীদের কারুর তো সরকারি স্কেল ছিল না — তাদের স্কেল হল কি করে? উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ওদের স্কেল হয়েছে। নাম বদলেছে। অঞ্চলে অঞ্চলে অফিস ঘরও হয়েছে। কিন্তু কেউ অবসর নিলে বা মরে গেলে তার জায়গায় লোক নেওয়া খুব একটা চোখে পড়ে না। ওরা অনেক আন্দোলন করেছেন। কিন্তু স্কেল ক'জন বয়স্ক মানুষ আর ভোগ করেছেন! আমরা তো ১৯৮৩ সাল থেকে আন্দোলন করছি। একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটির ব্যানারে আর একটা 'পশ্চিমবঙ্গ কর আদায়কারী সমিতি' নামে নিজস্ব সংগঠনের ব্যানারে। সারা পশ্চিম বাংলায় আমরা চার হাজার পাঁচশ মানুষ এই চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করি। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের পাশে কোন পার্টির নেতারাই আজ পর্যন্ত দাঁড়ায় নি"। "আমরা কোলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টেও আপীল করেছি। কিন্তু ফল পাই নি।"

মনে পড়ে গেল রেলমন্ত্রী জাফর শরীফের আমলে কয়লার ইঞ্জিন উঠিয়ে দেওয়ার ফলে বেকার হওয়া ১০ হাজার রেল কর্মচারীরর কথা যারা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে ২০০০ সালে রায় পেয়েছিলেন তাদের অনুকূলে। কিন্তু মাত্র কয়দিন আগেও সংবাদপত্রের পাতায় দেখা গেল দুই দফায় মাত্র ২০৩ জনকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক সমাবেশে বলেছেন যে রাজ্য সরকার এবার থেকে আর অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করবে না এবং এখন যারা অস্থায়ী আছেন তাদের স্থায়ী করা হবে। নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এরকম প্রতিশ্রুতি নেতা-মন্ত্রীরা প্রায়শই দেন। সারা জীবনেও সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় না। এই মানুষগুলোর সুদিনই হয়ত ততদিন আসবে না যতদিন না দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের জোয়ার আমাদের পরিচিত সব হিসাব উল্টে দিয়ে যাবে। অপেক্ষায় থাকা নয়, সে দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসার সংগ্রাম শক্তিশালী হোক।

সত্যম, অ-সত্যম এবং 'সত্যমেব জয়তে'

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ওয়াকিবহাল এবং সবাই তা চোখ বুজে অনুমোদন করে থাকে। খাতায় পত্রে নানা উপায়ে কারচুপি করে নিয়মিতভাবে সরানো এই অর্থ কি কাজে লাগে তাও সবাই জানে। ছোট বড় যে কোন সরকার কাজের বরাত পেতে গেলে একেবারে নিয়ম (!) মেনে দপ্তরে ঘুষ দিতে হয়। কত টাকার কাজ পিছু কত শতাংশ ঘুষ দিতে হবে তা সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতরে একেবারে নিখুঁতভাবে নির্দিষ্টকরণ করা আছে। এছাড়া পুঁজিপতিদের প্রতিটি সংস্থা নির্বাচনের সময়ে বা অন্যান্য প্রয়োজনে তাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণ টাকা দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের রাজনীতিতে এই ঘটনা নতুন নয়। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বিড়লারা গান্ধীকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপঢৌকন দিতেন তখন থেকে অদ্যাবধি এ জিনিস রাজনীতিতে স্বাভাবিক বিষয় হিসাবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। বিনিময়ে রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে পুঁজিপতিদের নানারকম অন্যায্য এবং বে-আইনী সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। এসব ঘটনা জানে না এমন অপাপবিদ্ধ লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাপি রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলোর সমস্ত নেতারা ন্যাকা সাজার চেষ্টা করেন এবং খবরের কাগজে তা গুরুত্ব দিয়ে ছাপাও হয়।

এখন প্রশ্ন হলো কোনো কোম্পানীর ব্যালান্স শীটেই এই সমস্ত টাকার কোনো উল্লেখ থাকে না। তাহলে নিশ্চয়ই একথা বলা যায় যে প্রত্যেকটি কোম্পানীর ব্যালান্স শীটেই এই ধরনের হাজার রকমের কারচুপি এবং জালিয়াতির অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত রাজুর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হলো যে তিনি এক কোম্পানীর টাকা তার অন্য কোম্পানীতে সরিয়েছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই ঘটনাও সমস্ত কোম্পানীতেই আকছার ঘটছে। এক গণ্ডা একই গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানী (গ্রুপ কোম্পানি) তৈরী করে সুবিধামত এক কোম্পানীর টাকা অন্য কোম্পানীতে সরানো কর্পোরেট সংস্থাগুলোতে খুবই চালু একটা পদ্ধতি। এমনকি গ্র্যাচুইটি, পেনসন ফাণ্ড বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা যেখানে হাত পর্যন্ত দেওয়া বে-আইনী সেই টাকাও কোম্পানীগুলি নিজেদের ব্যবহারে নিয়মিতভাবেই কাজে লাগায়। পার্টি, প্রশাসন, সরকার সব কিছু জেনেও নিশ্চুপ থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। পশ্চিমবঙ্গের চটকল মালিকরা যে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর টাকা নিয়মিত সরকারী কোষাগারে জমা দেয় না এবং এইভাবে এক বিরাট পরিমাণ টাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে (সরকার এবং সরকারী পার্টিগুলির সাহায্যে) নিজেদের কাজে লাগায় যে কথা সবাই জানে। কিন্তু ব্রিটানিয়ার মতো একটি বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার পেনসনভোগীরা ২০০৫ সালে অভিযোগ তোলে যে ব্রিটানিয়া কর্মীদের পেনসন ফাণ্ড থেকে ২০০৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ১২ কোটি ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা চুপিসাড়ে সারিয়ে নিয়েছে। এই ঘটনা বিশেষ তহবিল আইনের ২৮নং ধারা এবং আয়কর আইনের ৯১(১) ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনী। ব্রিটানিয়ার অডিটর সংস্থা সি.সি. চোকসী এন্ড কোম্পানী গোটা ঘটনা জেনেও তা নিয়ে কোন আপত্তি তোলে নি। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সর্বভারতীয় সংস্থা আই.সি.এ.আই-তে এই মর্মে ব্রিটানিয়া পেনসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন একটি মামলাও (কেস নং ২৫ সি.এ (৯৯)/২০০৫, সেপ্টেম্বর ২২, ২০০৫) রুজু করে। এই কেসে আই.সি.এ.আই অডিটর সংস্থা সি.সি. চোকসী এন্ড কোম্পানীকে প্রাথমিকভাবে (প্রাইমা ফেসি) দোষী সাব্যস্ত করে এবং কালো তালিকাভুক্ত করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ (দেশের সরকার সমেত) এই ঘটনা জানলেও কি এক মন্ত্রবলে এই চোকসী কোম্পানী বর্তমানে ডেলোইট নামক এক বৃহৎ বহুজাতিক অডিটর সংস্থার অন্তর্ভুক্ত কোম্পানী হিসাবে দিব্য কাজ করে চলেছে। এমনকি বর্তমানে সত্যমের অডিটর সংস্থা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্সকে হটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংস্থাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছেন তার নাম ডেলোইট, কালো তালিকাভুক্ত চোকসী এন্ড কোম্পানী যার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রাইস ওয়াটার হাউস বর্তমানে কালো তালিকাভুক্তির দোরগোড়ায় এবং সংস্থার দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এস. গোপালকৃষ্ণণ এবং শ্রীনিবাস তালৌরি পুলিসের হেফাজতে রয়েছেন। কিন্তু ব্রিটানিয়া ইন্ড্রাস্ট্রিস এখনও সম্মানের সঙ্গে বাজারে বিচরণ করছে এবং চোকসী আবার ঘুরপথে নতুন বরাতও পেয়ে গেছে তা তো দেখাই গেল। এরকম লক্ষ লক্ষ ঘটনা দেশের জনতার অজ্ঞাতসারে নিয়মিতভাবেই ঘটে চলেছে।

সুতরাং একা সত্যমকে দোষ দিয়ে এখন সবাই যে সাধু সাজতে চাইছে এর থেকে বড় অসত্য আর কিছুই হতে পারে না। ঠিক যেমন হতে পারে না এই ঘটনাও যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এই মুহূর্তে বেশি বেশি করে যেটি প্রথম করার চেষ্টা করছেন যে সত্যমের ঘটনা আসলে এই জাতীয় তহবিল তছরুপের ঘটনামাত্র। কিন্তু ঘটনা যদি শুধু তাই হত তাহলে সত্যম কাণ্ড ইতিমধ্যে কর্পোরেট মহলে যে পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা হত না। সরকার, বিরোধী, পুঁজিপতি, মিডিয়া প্রভৃতি সব পক্ষই সত্যম কাণ্ডের যে দিকটা আড়াল করতে চাইছে আমরা এবার সে দিকটা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

রামালিঙ্গম রাজুর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে যে তিনি তার কোম্পানী থেকে বে-আইনীভাবে পয়সা উঠিয়ে মরিসাসে পাঠিয়েছিলেন। এইবার কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোতে থাকল। দেখা গেল মারিশাস এমন একটা দেশ যেখান থেকে কোন টাকা ভারতে আসলে সেই টাকার উৎস কি সেটা জানা যায় না। ভারতের শেয়ার বাজারে যে বিরাট পরিমান বিদেশী পুঁজি আসে তা এই মরিশাস হয়েই আসে। দেশের শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি এই মরিশাস পথে ভারতে আসা পুঁজিকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য পি.এল নামের একটি সাব অ্যাকাউন্ট-এর অনুমোদন দিয়ে রেখেছে যেখানে টাকার মালিকের নাম উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক নয়। ২০০৭ সালে সেবি একবার এই পথ বন্ধ করার উদ্যোগ দেখিয়েছিল। সেই সময় কিসিংগার, মালফোর্ড প্রভৃতি আমেরিকা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের চাপে আন্তর্জাতিক ফাটকা পুঁজির সঙ্গে সেবি একটা রফা করে নেয়। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশদ্ভূত নবীনচন্দ্র রামাগুলাম এ দেশে সফরে আসেন। তার বংশের জন্মভূমি বিহার পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রচুর আবেগাশ্রু বিসর্জন করেন। সোনিয়া গান্ধী গোলাপ ফুল এবং মালদহের আম উপহার দেন। মরিশাস রুট খোলাই রয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ফাটকা পুঁজি ঐ পথে চলাচল করতে থাকে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে যে সমান্তরাল কালো টাকার প্রবাহ চলে তা হাওয়ালার মাধ্যমে মরিশাস গিয়ে আবার বেনামে সাদা টাকা হয়ে ফিরে আসে এবং পি. এন অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারে লগ্নি করা হয়ে থাকে। শুধু রাজু নন, সমস্ত নামজাদা বড় কর্পোরেট সংস্থা, পুঁজিপতিদের গোটা দঙ্গলটাই এইপথে কালো সাদার খেলা খেলে এবং ফাটকায় লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, সংস্থার সম্পদ আসলের তুলনায় বাড়িয়ে দেখিয়ে শেয়ার বাজারকে কৃত্রিমভাবে প্রভাবিত করা এবং নিজেদের শেয়ার মূল্য বাড়িয়ে তুলে অতিরিক্ত লাভ করে নেওয়ার ফাটকাবাজী আজকের ফাটকা নির্ভর পুঁজিবাদের এক অঙ্গাঙ্গী বৈশিষ্ট্য। এ জিনিস নিয়মের বিকৃতি নয়, বরং এই হলো খোদ নিয়ম। বুদবুদ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটাবার এই মিল্টন ফ্রীম্যানীয় নীতি হলো নয়া উদারবাদের অর্থনীতির ভিত্তি যার জেরে আজ সারা বিশ্বে তীব্র মন্দা চলছে। সারা পৃথিবীতে ১১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়েছে যার কাছে সত্যমের ৭,৮০০ কোটি টাকার জালিয়াতি তুচ্ছ। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। সপরিবারে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। আইসল্যান্ডের সরকারের পতন হয়েছে। রাজু স্বীকার করেছেন যে সংস্থার সম্বন্ধে এই ধরনের বুদবুদ তিন তৈরী করেছিলেন এবং তা দিয়ে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু এই যদি খেলার নিয়ম হয় তাহলে সমস্ত খিলাড়ীই তো এই একই খেলা খেলছে। এবং ঘটনা হলো এই খেলা খেলতে গেলে তো শুধুমাত্র হিসাবের কারচুপি করেই হয় না। বাজার থেকে কাঁচা পয়সার নিরন্তর প্রবাহ আসতে হয়। তবেই একটানা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে হিসাবের কারচুরিকে লুকিয়ে রাখা যায় এবং বুদবুদকেও বাঁচিয়ে রাখা যায়। মন্দার বাজারে টাকার জোগান শুকিয়ে যেতে এখন আসল সত্য ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা সমস্ত 'সম্মানীয়' এবং 'আদর্শ' পুঁজিপতিদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। সুতরাং এবারে সরকার তুমি টাকা দাও। জনগণের অর্থে নিজেদের নোংরা পরিস্কার করি এবং নিজেদের 'সম্মান' এবং চামড়া বাঁচাই। বেচারা চিদাম্বরম এই ব্যাপারে কিছুটা টালবাহানা করার ফলে পুঁজিপতিদের এমন ক্রোধ তৈরী হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি তাকে সরিয়ে মনমোহন সিং-এর হাতে অর্থ দপ্তর তুলে দেয়। পৃথিবী জুড়েই সরকারগুলো এই কাজ করছে যার পরিচিত নাম হলো বেল আউট। কিন্তু সরকারী অর্থ কারভাগে কতটা যাবে এবং কত তাড়াতাড়ি যাবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় তৈরী হয়েছে আতংক এবং শুরু হয়েছে তত জোর চীৎকার — আমরা কিন্তু সত্যম নই। সরকারও চেষ্টা করছে ঘটনাকে অন্য দিকে ঘোরাতে।

তৃতীয়ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রসঙ্গে আমাদের খেয়াল করতে হবে। রাজু আত্মপক্ষ স্বীকার করতে গিয়ে আরও একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সম্পদ বাড়িয়ে দেখিয়ে তিনি সত্যমের মালিকানা নিজেদের পরিবারের হাতেই রাখতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি প্রনিধানযোগ্য। আসলে জটৈন্ট স্টক বা যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলি এমনভাবে চলে যে, যে কোন মুহূর্তে সংস্থার যে মূল উদ্যোক্তা তার হাত থেকে কোম্পানীর পরিচালনা অন্য কারোর হাতে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানীতে উদ্যোক্তার অংশীদারী বা শেয়ার যদি নীচে নেমে যায় তাহলে এটা হতে পারে। যেমন এই মুহূর্তে সত্যমের সমগ্র মূলধনে রাজু পরিবারের শেয়ার ৮ শতাংশের কাছাকাছি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লার্সেন এন্ড টুবরোর শেয়ার ১২ শতাংশের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই পরিচালন পর্ষদের ওপর লার্সেন এন্ড টুবরোর প্রভাব এমনকি উদ্যোক্তা পরিবারের থেকেও বেশি। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা পাঁচটি কোম্পানীর শেয়ারের বণ্টন ২০০৭-এর ডিসেম্বরে কেমন ছিল তার একটি তালিকা দিচ্ছি। তালিকাটি নিখুঁত নয়, কিন্তু এখান থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

কোম্পানী	উদ্যোক্তা	মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	বীমা কোম্পানী	বিদেশী আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ	অন্যান্য	খুচরো
টাটা মোটরস	৩৩.৪২	৩.২৮	০.৩০	১৩.৪৪	১৭.৪৮	১.০৭	১০.৪২
গ্রামীণ ইন্ড্রাস্ট্রিস	২৫.১৯	১০.১৫	০.২৭	১০.৩৮	২২.৩৭	৪.২০	১২.৩৩
ইউনাইটেড স্পিরিট	৩৬.৯৭	১.৭০	০.০৩	০.০০	৩৪.০১	১৪.৯২	৮.৪২
প্যান্টালুন্স রিটেল	৪৩.৪৭	১০.৪৮	০.০৮	১.৪০	২৫.১৮	৪.৯৩	১০.২৫
লয়েড স্টীল	১৮.৫১	০.৫১	৩.৯২	২.৩০	০.২৫	১৫.২৫	৪৮.৯২

এখন এই শেয়ার শতাংশের হিসাব সব সময়ে উলোটপালোট হতে থাকে। যে বিক্রী করে দেয় তার শেয়ার কমে যায়, যে কিনে নেয় তার শেয়ার বেড়ে যায়। শেয়ার কেনাবেচার এই নিত্য খেলায় হঠাৎ করেই নানা অঘটন ঘটে। যেমন গত বছর অতিরিক্ত পুঁজির প্রয়োজনে বহু কোম্পানী নিজেদের হাতে থাকা শেয়ার বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়েছিল। এদের মধ্যে রামলিঙ্গম রাজুও ছিলেন। এবারে বাজারে শেয়ারের দাম কমে যাওয়াতে বন্ধকী মালের দাম কমে গেল। এই দাম আরও কমে যাওয়ার আশংকায় যাদের কাছে শেয়ারগুলি বন্ধক রাখা হয়েছিল তারা দুম্ করে গোটা শেয়ারটাই একসাথে বাজারে বেচে দিলেন। ব্যাস, সব হিসাবে উল্টে গেল। একদিকে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম আরও কমে গেল অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের হাত থেকে বিরাট পরিমাণ শেয়ার তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাজারে চলে আসল। আর বাড়তি বাজারে সুযোগ বুঝে সেগুলি কিনে নিল অন্য খিলাড়ী এবং শেয়ার কেনাবেচার সেকেন্ডারী বাজারেই যে তারা লাভ করার রাস্তা তৈরী করল তাই নয়, সত্যমের মতো কোন কোন কোম্পানীর পরিচালন বোর্ডেও তারা জাঁকিয়ে বসল। এই ঘটনাকে ঠেকানোর জন্য সেবি এবার একটা অন্য রাস্তা খুলে দিল। সেটা হলো নিজের সংস্থা শেয়ার বাজার থেকে নিজেই কেনো। সাধারণভাবে এটি বে-আইনী এবং অর্থনীতির পরিভাষায় ক্রিপিং অ্যাকুইজিশন নামে পরিচিত। সত্যমের মত অনেক কোম্পানী এর সুযোগ নিল বং যে দামে তারা নিজেদের শেয়ার কিনল তার দাম ফুলিয়ে দেখাল। অডিটররা দেখেও দেখল না। বাজারে শেয়ারগুলির দাম বাড়তে থাকল এবং ফুলিয়ে দেখানো অংশটা বিশাল আকার ধারণ করে কোম্পানীর খাতায় জায়গা করে নিল। ফলে সংস্থাগুলিকে বাইরে থেকে হৃষ্টপুষ্ট দেখাতে লাগল কিন্তু আসল সত্য হলো এই রুগী রক্তাল্পতায় ভুগছে। অবশেষে রুগী শয্যা নিল এবং বাকি রুগীরা এবং সঙ্গে তাদের ডাক্তার, নার্স, জন্মদাতা, পরামর্শদাতা, উস্কানিদাতা, সাহায্যকারী সহচর সবাই তার মৃত্যু কামনায় এবং ধিক্কারে পাড়া মাথায় করে তুলল।

সুতরাং, বিশ্ব জুড়ে পুঁজির অবাধ গতি, ফাটকা পুঁজির রমরমা, কৃত্রিম উপায়ে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করা, কর্পোরেট সংস্থাগুলির গঠনবিন্যাস এবং অর্থব্যবসায় তার প্রভাব — এই সব মিলিয়ে আজকে যে বিশেষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তা নিজেই সমস্ত জালিয়াতি এবং কারচুপির এক অবিরাম জন্মদাতা। সত্যমের মত ঘঠনা আগেও ঘটেছে এবং বারবার ঘটবে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন সত্যমও থাকবে। নয়া উদারনীতি অর্থনীতির বিশ্বায়নী জাল থেকে মাঝে মধ্যে এই ধরনের ঘঠনা লোকচক্ষুর সামনে আসবে। আর বি. জে. পি বা সি.পি.এম. বা কংগ্রেসের মত পুঁজিপতিদের দলগুলো এবং তাদের সরকার এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি একদিকে এই অর্থনীতিকে লালন করছেন আর অন্যদিকে জাতির উদ্দেশ্যে অপাপবিদ্ধ বচনে ভাষণ দেবেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে। মাথার ওপর শোভা পাবে অশোক চক্র এবং জ্বলজ্বল করবে সনাতন মন্ত্র — সত্যমেব জয়তে!

পুনশ্চঃ — ঘটনা দ্রুত গতিতে ঘটে চলেছে। এই লেখা ছাপতে যাওয়ার আগে সত্যম কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এমন কয়েকটি বিষয় সামনে উঠে এসেছে যার উল্লেখ থাকা জরুরী। প্রথমতঃ, আমাদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রার অব কোম্পানী ছত্মখট্রগ্ন অর্থাৎ সংস্থাসমূহের লিপিবদ্ধকরণ অধিকর্তাকে আরও ১৫০টি কোম্পানীর কাগজপত্তর পরীক্ষা করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে। সেবিও এই কোম্পানিগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাজারে বন্ধক রেখে টাকা তোলার পরিমাণ এবং বন্ধকী শেয়ার সংক্রান্ত তথ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানো বাধ্যতামূলক — সেবির এই ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন কোম্পানীর নাম জানা যাচ্ছে। বড় আকারে উঠে এসেছে বিজয় মালিয়ার নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড স্পিরিট এবং রতন টাটা পরিচালিত টাটা সন্স-এর নাম। টাটা সন্স প্রায় ১৪ শতাংশ শেয়ার বন্ধক রেখেছে। ইউনাইটেড সিমেন্ট নামে একটি কোম্পানী ২৩ শতাংশ শেয়ার বন্ধক রেখেছে। তালিকা আশঙ্কাজনকভাবেই দীর্ঘ। বন্ধক রাখা শেয়ারের বিনিময়ে টাকা তুলে কোম্পানীগুলি কি খাতে তা খরচা করেছে তাও নাকি জানানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। শেয়ার বাজারের ব্রোকাররা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে কোম্পানীগুলি এই টাকা ক্রিপিং অ্যাকুইজিশনের কাজে ব্যবহার করেছে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেওয়া সত্যমের নতুন বোর্ড সংস্থার দীর্ঘদিনের ম্যানেজার এ. এস. মূর্তিকে নতুন প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছে, যার বিরুদ্ধেই নিজের সংস্থার শেয়ার বেচাকেনা (ইনসাইডার ট্রেডিং) করার এবং তার মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা কামানোর অভিযোগ রয়েছে। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করে ফাটকাবাজী, জুয়াচুরী এসবই আজকের পুঁজিবাদের অঙ্গাঙ্গী অংশ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং নয়া উদারবাদী নীতির প্রত্যক্ষ ফসল। কর্পোরেট জগতের সংস্কার প্রক্রিয়ার দেখনদারিও মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে, এবং যাবে। বিশেষ করে ২০০৯-এর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেই যখন সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো এই টাটা, আম্বানীদের গুণকীর্তন করবে। তাদের শিল্পে কর্মসংস্থানের রঙীন কল্পনায় মানুষকে বোকা বানাবে এবং তাদের টাকায় ভোটের খরচা তুলবে।

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নেপালের সংগ্রাম

শরিফুল ইসলাম

গত বছর ১০ এপ্রিল নেপালে 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী' নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত হয় কম্যুনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) বা সংক্ষেপে CPN(M)। পরবর্তীতে CPN(M)-এর নেতৃত্বেই গঠিত হয় সে দেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার; প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসেন CPN(M)-এর সাধারণ সম্পাদক, কমঃ প্রচণ্ড। ঠিক হয়, নির্বাচিত এই সরকারের তত্ত্বাবধানেই দুবছর ধরে দেশের 'সংবিধান' তৈরীর কাজ চলবে। দুবছর পর সেই নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে আবার পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দেশের সরকার নির্বাচিত হবে।

সরকারি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর, CPN(M)-এর পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে, কোন নীতির ভিত্তিতে তারা চলবে এসব নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরী হয়। কমঃ প্রচণ্ড, বাবুরাম ভট্টরাই প্রমুখ পার্টির প্রথম সারির নেতৃত্বের তৎকালীন কিছু মন্তব্যকে ঘিরেও সেই সময় নানান মহলে বেশ কিছু বিভ্রান্তি দানা বাঁধতে থাকে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলিও সেই সুযোগে সুকৌশলে প্রচার করতে নেমে পড়ে, সরকারি গদিতে আসীন হওয়ার পর CPN(M) আসলে তার 'বৈপ্লবিক কর্মসূচী' থেকে সরে আসছে; উন্নয়ন-সংস্কার-বিদেশী পুঁজি লগ্নি ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আসলে তাদের অবস্থান আর আমাদের দেশের CPM-এর অবস্থান মূলতঃ একই; বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কমঃ প্রচণ্ডরা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

কিন্তু আসল ঘটনাটি ঠিক কি? কি নিয়েই বা CPN(M)-এর মধ্যে মতপার্থক্য? সেই মতপার্থক্য কি এখনও চলছে, নাকি তা কাটিয়ে উঠে পার্টি কোনও ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে? বর্তমান প্রবন্ধে এসব প্রশ্নেরই একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর 'শ্রমিকশক্তি'র পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গতঃ, পাঠকদের মধ্যে নানান জিজ্ঞাসা থাকলেও গত তিন-চার মাস সচেতন ভাবেই এই বিষয়ে কোনওরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। কারণ ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে আরও কিছুটা বুঝে উঠার দরকার ছিল। বর্তমানে, বেশ কিছু নির্দিষ্ট তথ্য হাতে আসার পরই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ রাখা যেতে পারে।

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, তা হল আগামী দিনে চলার পথ নিয়ে পার্টির মধ্যে বিতর্ক যে আছে, CPN(M) কখনও সে কথা গোপন করেনি। বরং একদিকে তারা তাদের মুখপত্রগুলিতে বিতর্কটিকে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, এবং অন্যদিকে পার্টির মধ্যে সেই বিতর্কগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়। ফলে, বিতর্ক ঠিক কি নিয়ে, সেই বিষয়ে কার বক্তব্য কি ছিল, এখন-ই বা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক কি — এ নিয়ে CPN(M) নিজে অন্ততঃ কোনও রাখ-ঢাক গুড়-গুড় করেনি। সব কিছুই তারা তাদের পাক্ষিক মুখপত্রে জানাতে জানাতে গেছে। মূলতঃ সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

গত বছর ৪-৬ অক্টোবর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভায় প্রথম বিতর্কটি সংগঠিত আকারে সামনে আসে। সেই সভায় কমঃ প্রচণ্ড একটি মৌখিক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল, নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' তৈরী হয়েছে তাকে রক্ষা করা এবং বিকশিত করাটাই এখন পার্টির মূল কাজ হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থটা কি? অর্থটা ছিল এইরকম CPN(M) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে সরকারে বিভিন্ন সংসদীয় এবং বুর্জোয়া দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে এই মুহূর্তে সে বাধ্য হচ্ছে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দখল করাটাই যদিও CPN(M)-এর অন্তিম উদ্দেশ্য, কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। কাজেই একটা সময়পর্ব পর্যন্ত, বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করেই CPN(M)-কে সরকারে থাকতে হবে, এবং চেষ্টা করতে হবে তার মধ্যেই যাতে যতটা সম্ভব মেহনতীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা যায়।

'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হল এমন একটি ব্যবস্থা, এমন একটি আধার, যার মধ্যে মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে CPN(M) এবং বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে নেপাল-কংগ্রেস, UML প্রভৃতি দলগুলি নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং ইতিবাচক প্রতিযোগিতা চালাবে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন দুঃখ-দারিদ্র ক্লিষ্ট নেপালী জনতার আশু সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে, উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবে; অন্যদিকে তেমনি জনগণও অন্যান্য দলের সঙ্গে CPN(M)-এর বক্তব্যকে আরও নিবিড় ভাবে তুলনা করার সুযোগ পাবে, যা ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য জমি প্রস্তুত করবে। — সংক্ষেপে, এই ছিল কমঃ প্রচণ্ড-র প্রস্তাব এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি।

এই প্রস্তাবের বিপরীতে কমঃ কিরণ সেই সভাতেই একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন লিখিত আকারে। তাঁর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'র স্তর ইতিমধ্যেই যখন অর্জিত হয়েছে, তখন সেখানে আটকে না থেকে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' গঠনের স্লোগানকে সামনে রেখে এবার পার্টির আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল, শ্রেণী সমঝোতার পথে আটকে পড়া নয়, বরং উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণী সংঘর্ষের পথকেই আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত। 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা, কাজেই সেটিকে টিকিয়ে রাখা এবং বিকশিত করার অর্থ বিভিন্ন শত্রু শ্রেণীগুলির (বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রভুদের) সঙ্গে বস্তুত একটি সমঝোতা চালানো, যা বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে দলকে বিচ্যুত করবে। পার্টির বরং উচিত, শ্রেণী দ্বন্দ্বকে অমীমাংসিত না রেখে তা আরও তীব্র করে তোলা। আর 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'র স্তর অতিক্রম করে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' গঠনের স্লোগানকে সামনে রাখলেই একমাত্র সেদিক এগোনো সম্ভব হবে। কারণ 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' হল এমন একটি ব্যবস্থা, যাতে সংখ্যাগুরু মেহনতী জনগণের স্বার্থেই কেবল সুরক্ষিত থাকে, ফলে অবধারিত ভাবেই কোপ পড়ে বুর্জোয়া এবং সামন্ত প্রভুদের ওপর। সেই পথে এগনোর জন্য যদি CPN(M)-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মুখ থুবড়ে পড়ে তো পড়ুক, রাজনৈতিক সাম্যাবস্থা যদি বিঘ্নিত হয় তো হোক, বিপ্লবের পথ তাতে বরং প্রশস্ত-ই হবে। — সংক্ষেপে, এই ছিল কমঃ কিরণ-এর প্রস্তাব এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি। এমন একটি ব্যবস্থা, যাতে সংখ্যাগুরু মেহনতী জনগণের স্বার্থে কেবল সুরক্ষিত থাকে, ফলে অবধারিত ভাবেই কোপ পড়ে বুর্জোয়া এবং সামন্ত প্রভুদের ওপর। সেই পথে এগনোর জন্য যদি CPN(M)-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মুখ থুবড়ে পড়ে তো পড়ুক, রাজনৈতিক সাম্যাবস্থা যদি বিঘ্নিত হয় তো হোক, বিপ্লবের পথ তাতে বরং প্রশস্ত-ই হবে। — সংক্ষেপে, এই ছিল কমঃ কিরণ-এর প্রস্তাব এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি।

যাই হোক, পরস্পর বিরোধী এই দুটি প্রস্তাবের মধ্যে তাৎক্ষণিক ভাবে কোনও একটিকে বেছে না নিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, গোটা পার্টি জুড়েই এ বিষয়ে বিতর্ক চালানো হবে এবং পরবর্তীতে পার্টির সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'জাতীয় কনভেনশন' আয়োজিত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সেই মোতাবেক, গত ২১-২৭ নভেম্বর ২০০৮, সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'জাতীয় কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে কমঃ প্রচণ্ড এবং কমঃ কিরন দুজনেই তাঁদের প্রস্তাব পেশ করেন। প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী নিরন্তর আলাপ-আলোচনা এবং তীব্র বিতর্ক চালানোর পর অবশেষে পার্টি একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছাতে সমর্থ হয়। হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কোনও একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে লাগাতার বিতর্ক চালাচ্ছেন এবং অবশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন — এমন ঘটনা নেপালে তো বটেই, গোটা পৃথিবীর বর্তমান কম্যুনিস্ট আন্দোলনেই বিরল। যাই হোক, কনভেনশন থেকে কমঃ প্রচণ্ড এবং কমঃ কিরণ, দুজনের পেশ করা দুটি প্রস্তাবের কোনও একটিকে গ্রহণ এবং অন্যটিকে বর্জন না করে সিদ্ধান্ত হয়, দুটি প্রস্তাবেরই ন্যায্য যুক্তিগুলির সমন্বয়ে একটি তৃতীয় প্রস্তাব তৈরী করা হবে। প্রস্তাবের মূল মূল বিষয়গুলি নিয়ে সহমতে পৌঁছানোর পর কনভেনশন থেকেই ঠিক করে দেওয়া একটি বিশেষ কমিটি সেই তৃতীয় প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করে, যা এই পর্যায়ে 'পার্টির ঘোষিত অবস্থান' হিসাবে সকলেরই স্বীকৃতি পায়।

তৃতীয় এবং সর্বসম্মত এই প্রস্তাব অনুসারে বর্তমান নেপাল রাষ্ট্রকে একটি 'জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র' (পিপল্‌স্ ফেডারাল ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল রিপাবলিক) হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে, সংক্ষেপে যাকে বলা হচ্ছে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' বা 'গণ প্রজাতন্ত্র' (পিপল্‌স্ রিপাবলিক)।

এখন কথা হল, 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটির আগে, এতগুলি বিশেষণ যোগ করার বিষয়টি পাঠকদের কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার, এই বিশেষণগুলি কেন যোগ করা হল, বিশেষণগুলির মানেটাই বা ঠিক কি, সেটা বুঝতে না পারলে CPN(M)-এর মধ্যেকার বিতর্কটিকেও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিষয়টিকে আর একটু পরিষ্কার করার জন্য আমরা CPN(M)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম এক তাত্ত্বিক নেতা সি.পি.গজুরেল-এর একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করবো।

''ঠিক এই মুহূর্তে আমরা দুটো রাস্তার মোড়-এর মাথায় দাঁড়িয়ে। আমরা কি 'জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র' গঠনের দিকে এগোবো, নাকি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'-কেই আরও সংহত করবো, যা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে? যাঁরা এই দুই 'প্রজাতন্ত্র'-এর মধ্যে তফাৎটা ধরতে পারছেন না, তাঁরা এই বলে আমাদের দুষছেন যে আমরা খামোকা একটা বাজে বিতর্ক বাধাচ্ছি। কিন্তু এই দুধরনের 'প্রজাতন্ত্র' শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে বা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একেবারেই আলাদা।

''জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র, এটি আর কিছুই নয়, এটি হল অন্তর্বস্তুতে নেপালের বৈশিষ্ট্য সহ নেপালী গণ-প্রজাতন্ত্র, যা কিনা সমস্ত নেপালী জনতার আবেগকে ধারণ করবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এটি হল একটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণী যাকে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। চরিত্রের দিক থেকে এই প্রজাতন্ত্র হবে সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। অনেকেই অবাক হচ্ছেন, 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটির আগে এতগুলো বিশেষ্য বা বিশেষণ জোড়ার কারণটা কি! যেহেতু এই প্রজাতন্ত্র আপামর নেপালী জনতার আবেগকে ধারণ করছে, তাদের দাবীকে মর্যাদা দিচ্ছে, সেই কারণে এটিকে 'জনগণের' প্রজাতন্ত্র বলা হচ্ছে। 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' শব্দটার মধ্যে দিয়ে নতুন নেপাল রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বোঝানো হচ্ছে, যা পুরোনো এক-কেন্দ্রীক কাঠামোর থেকে আলাদা। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ নতুন এই প্রজাতন্ত্রে নেপালী জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আর নতুন নেপাল, যেহেতু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানে বৈদেশিক প্রভাব-এর মুখোমুখি হয়ে চলেছে, কাজেই আমাদের প্রজাতন্ত্রকে অবশ্যই 'জাতীয়' সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও

ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে।...

''আমরা সকলেই জানি, 'প্রজাতন্ত্র' হল এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে 'রাজতন্ত্র' থাকে না। একমাত্র ভূটান ছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী প্রতিটি রাষ্ট্রই সেই অর্থে প্রজাতান্ত্রিক', যেমন — ভারত, চীন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ — কিন্তু প্রতিটি প্রজাতন্ত্রেরই কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হল আদতে একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, যা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদকেই আরও শক্তিশালী করে।''

''সুতরাং 'জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র' এবং 'যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' একেবারেই এক নয়, বরং দুটো আলাদা এবং পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা। এই দুই 'প্রজাতন্ত্র'-এর মধ্যে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।'' (রেড স্টার, জানু ১৬-৩০, ২০০৯)

— অর্থাৎ, কমরেড গজুরেল-এর লেখা থেকে আমরা দেখলাম, CPN(M) অন্তত একটি বিষয়ে ঐক্যমতে এসে পৌঁছেছে যে, সাফল্য যতদূর অর্জিত হয়েছে, সেখানেই আটকে না থেকে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? কোথায়, কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে এই সংগ্রামগুলি পরিচালনা করা হবে? সে সম্পর্কেও পার্টি একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা হাজির করেছে। পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে, মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্রে এই সংগ্রামগুলি চলবে — সরকারের মধ্যে, সংবিধান সভার মধ্যে এবং প্রকাশ্য রাজপথে। সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলি পুরোনো আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সামন্ততন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করার চেষ্টা করবে এবং CPN(M) তার উল্টোদিকে মেহনতী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য লড়াই চালাবে। সংবিধান সভার মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি চাইবে সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদের স্বার্থে যায়, এমন আইন প্রণয়ন করতে, CPN(M) সেই প্রচেষ্টাকেও বাধা দেবে এবং এমন আইন-ই তৈরী করার চেষ্টা করবে যা মেহনতী মানুষের স্বার্থে যায়। সর্বোপরি, মেহনতী মানুষের স্বার্থবাহী সমস্ত লড়াইকেই প্রকাশ্য রাজপথে এনে ফেলা হবে এবং সংগ্রামের এই তৃতীয় ক্ষেত্রটি, অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজপথের লড়াইটিই থাকবে গুরুত্বের বিচারে এক নম্বরে।

— সংক্ষেপে, এই হল CPN(M)-এর মধ্যে চলমান বর্তমান বিতর্কের স্বরূপ এবং সে-সম্পর্কে পার্টির গৃহীত অবস্থান। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন। পার্টির মধ্যেকার বিতর্কগুলিকে মীমাংসা করে CPN(M) একটা ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীকে সর্বসম্মতি-ক্রমে গ্রহণ করতে পেরেছে — এটা খুবই আশার কথা। আগামী দিনে তারা যেভাবে পথ-চলার কথা ভাবছে, এবং সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ভাবে যে অবস্থান নিচ্ছে, তাও গভীর উৎসাহ ব্যাঞ্জক। কিন্তু কেবল তাত্ত্বিক অবস্থান নয়, বাস্তবে সেই অবস্থানগুলি কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে, শেষতঃ তার উপরেই নির্ভর করবে CPN(M)-এর ভবিষ্যৎ। 'গণমুক্তি ফৌজ' ও 'নেপাল আর্মি'র সংযুক্তির বিষয়টি কিভাবে মীমাংসা করা হবে, বিদেশী পুঁজি নেওয়া অথবা না নেওয়ার প্রশ্নে ঠিক কি নীতি গ্রহণ করা হবে, দেশের বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠী, যাদের অনেকের সঙ্গেই আবার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির গভীর যোগাযোগ, তাদের সম্পর্কেই বা ঠিক কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে — সে সবের ওপরেই বাস্তবতঃ নির্ভর করে আছে নেপালের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যত। ঐতিহাসিক এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে নেপাল তথা নেপালী মেহনতী জনতার বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন। গভীর মমত্ববোধ এবং সতর্ক দৃষ্টি নিয়েই এই আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপগুলিকে আমাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া